Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণা

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.2
Pages	16-49
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুহম্মদ এনামুল হকের গবেষণা

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম (১৮৯৮-১৯৮১) বলেছেন : "১৯৩৬ নাগাদ আমি তাঁর চিঠি পাই। ···আমি মুকিমের 'গোলে বকাউলী' ···নিয়ে তাঁর বাড়ি যাই। ···(সাহিত্য বিশারদ) বললেন : এখন শোবেন কোথায়, পুথিপত্র আর ছারপোকায় ভর্তি হয়ে আছে। পুথি-পত্রের সংগ্রহের মাঝখানে দেখা গেল এক ব্যক্তি কেরোসিনের কূপী জ্বেলে তপস্যা করছেন, তিনি (ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক।"[১]

এ-'তপস্যা'য় তাঁর সঙ্গী ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। ১৯৩২ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান অবদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সুচক্রদণ্ডীর বাড়িতে তিনি প্রায় তিন মাস কাল অবস্থান করে 'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থের তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করেন।

'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (খ্রীস্টীয় ১৬০০-১৭০০ অব্দ) বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এর একটি জেরক্‌স্ কপি।[২] এ-গ্রন্থ লেখা হয় ১৯৩২ সালে কিন্তু প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছিল ফিনিক্‌স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৯ নং কালিদাস সিংহের লেন কলিকাতায় অতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক। প্রকাশক: সাহিত্য-সাগর মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, গ্রাম-সুচক্রদণ্ডী, পোঃ পটিয়া, চট্টগ্রাম। গ্রন্থকারদ্বয় কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত।

'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য'-এর উৎসর্গ পত্র নিম্নরূপ : "উৎসর্গ/যেই/ একনিষ্ঠ/ বঙ্গবাণী-সেবকের / একবিন্দু সহৃদয়তার অভাব ঘটিলে/আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য / প্রকাশিত হওয়া দূরের কথা, লিখিত হইত কিনা সন্দেহ, / সেই মহানু-ভব / রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর / মহোদয়ের পুণ্য নাম বক্ষে ধরিয়া / এই পুস্তক / গৌরবান্বিত / হইল।

এ-গ্রন্থের লেখক হিসেবে যুগ্মভাবে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এম. এ., পিএইচ. ডি. এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-এর নাম মুদ্রিত হয়েছে। তিনমাস কাল আতিথেয়তা এবং পুথি পাঠ করে তথ্য-উদ্ধার করে দেবার কৃতিত্ব সাহিত্য-বিশারদের ; এ-জন্যই এ-গ্রন্থের যুগ্মলেখক হিসেবে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়।

প্রাচীন-সাহিত্য, পুথি-সংগ্রহ এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি আবদুল করিমের অসীম ভালবাসা ডক্টর হককে মুগ্ধ করেছিল—সে-সময়ই উভয়ের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য হৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাহিত্য বিশারদ মুহম্মদ এনামুল হককে মানস-পুত্র জ্ঞান করতেন—ডক্টর হকও সুখে দুঃখে সারাজীবন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, সম্ভাব্য দায়িত্ব পালন করেছেন।

'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. ডি. লিট। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সে-ভূমিকাটি কৌতূহলীদের জন্য এখানে উদ্ধৃত হলো :

> এদেশের ইতিহাসের যতই সন্ধান হইতেছে, ততই আমরা বঙ্গদেশের গৌরব বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এক সময় বঙ্গভাষা পূর্বভারতের বহুদূর পর্যন্ত রাজসভায় সম্মান পাইয়াছিল,—তাহা আলোচ্য পুস্তকখানি ও অপরাপর গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শুক্রেশ্বর ও বানেশ্বর প্রভৃতির ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ বহু পণ্ডিত যে ত্রিপুরেশ্বরের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের সভায় ত্রিপুরার রাজমালা বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার স্বাধীন রাজারা সুচিরকাল হইতে তাঁহাদের রাজসভা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালা ভাষায় সমস্ত দলিল-পত্র লিখাইতেন; এমন কি তাহাদের তাম্র শাসনেও বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরে তাহাদের আদর্শ উৎকীর্ণ করাইতেন। আসামে সেদিন পর্যন্তও বঙ্গভাষায় জন-সাধারণের শিক্ষাদীক্ষা নির্বাহিত হইত। এক শতাব্দীও হয় নাই, কতকগুলি স্বার্থান্ধ পাদ্রীর চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা আসামে হতাদৃত হইয়াছে। বঙ্গের পূর্বপ্রান্তের অত্যুঙ্গ গিরিমালার সীমা অতিক্রম করিয়া সেই ভাষা প্রাচীন কালে আরাকান দেশে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চার সোনার ফসল ফলিয়াছিল। গ্রন্থকারদ্বয় এই পুস্তকে এ দেশের এই সময়কার বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার যে অমূল্য ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়কে আশ্চর্যরূপে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।
>
> বঙ্গভাষার সম্প্রসারণ শক্তি আশ্চর্য; ইহা প্রাচীনকাল হইতেই আপনাকে দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিল। বালীদ্বীপের তাম্র-শাসন ও শিলালিপিগুলি তৎসময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। জাপানের পুরোহিতগণ ধর্মপুস্তক লিখিতে দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে লিখিত একখানি পুথী "হ্রারিউজী" মন্দিরে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সেন রাজাদের তাম্রপটের অক্ষরের অনুরূপ। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালীগণ পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র তাঁহাদের ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা ভাষা তথাকার বহুদেশে আদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুদূর আরাকানেও বাঙ্গালা ভাষার যে উৎকর্ষ দেখতে পাই তাহার ভিত্তি যে কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঐ দেশে বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহভাবেই বলিতে পারা যায়।
>
> এই পুস্তকখানি এবং বঙ্গপল্লীর প্রাচীন গীতিকাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, কিছুদিন পূর্বেও বঙ্গভাষা হিন্দু কি মুসলমানের নিজস্ব বলিয়া কোন ছাপ ছিল না—ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য ছিল, আরাকানে

মুসলমান কর্মচারীরা আদর করিয়া এই ভাষাকে 'দেশী ভাষা' নাম দিয়া সম্মান করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরাগল খাঁর আশ্রিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের এবং ছুটি খাঁর প্রিয় কবি শ্রীকর নন্দীও এই ভাষাকে দেশী ভাষা নাম দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এ ভাষা এদেশবাসীর মাতৃভাষা বলিয়া আদৃত ছিল। সেখানে গোঁড়া মোল্লা ও টুলো পণ্ডিত একদিকে আরবী ফারসী ও অপর দিকে সংস্কৃত শব্দের মালমসলা ঢুকাইয়া বাংলা ভাষার কেল্লা দখল করিতে প্রয়াস পান নাই। পূর্ব বঙ্গগীতিকার (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা) 'মানিকতারা' নামক পালায় জামাইত উল্লা যে অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার সমকক্ষতা করিতে পারে, এইরূপ হিন্দু কবির সংখ্যা অতি অল্প। এই পুস্তকে লেখকদ্বয় কবি দৌলত কাজীর (১৬২২-১৬৩৮ খ্রী. আবির্ভাবকাল) 'সতী ময়না' নামক কাব্যের যে অপূর্ব কবিত্ব সম্পদের কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই বলিবেন যে, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির কৃতিত্ব গৌরব যতটা হিন্দুর ততটা মুসলমানের। ইহাদের এক সম্প্রদায় যদি তাহাদের স্বীয় সৃষ্ট কীর্তি হইতে কোন অজুহাতে সরিয়া দাঁড়ান, তবে তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের পূর্ব পুরুষের অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবেন মাত্র।

এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন সাহিত্যরথী মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ,—তিনি দ্রোনাচার্য সদৃশ এবং তাঁহার সহকর্মী মুহম্মদ এনামুল হক (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত) পি-এইচ. ডি.—ইনি অর্জুন তুল্য। এই প্রবীন ও নবীন কৃতিদ্বয়ের গবেষণাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব যে আবিষ্কৃত হইবে তাহা আমরা অনেক দিন পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সে সময় হইতে আমরা তাহাদের নূতন আবিষ্কারের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সোৎসুক মনে প্রার্থনা করিতে-ছিলাম। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় এই মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের সে উৎসুক্য আংশিকভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের এই নবীন অবদান খানি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অবশ্যই পঠিতব্য।

বেহালা শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন
চব্বিশ পরগণা
নবেম্বর ১৯৩৪ ইংরেজী

আলোচ্য পুস্তকখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ-গুলো নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়—আরাকান রাজসভা
দ্বিতীয় অধ্যায়—রোসাঙ্গ রাজসভা-কবি প্রথম প্রসঙ্গ : দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত
তৃতীয় অধ্যায়—রোসাঙ্গ রাজসভা-কবি দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : কোরেশী মাগন ঠাকুর
চতুর্থ অধ্যায়—রোসাঙ্গ রাজসভা-কবি তৃতীয় প্রসঙ্গ : মহাকবি আলাওল
পঞ্চম অধ্যায়—রোসাঙ্গ রাজসভার বাঙ্গালা সাহিত্য বিকাশের ধারা
ষষ্ঠ অধ্যায়—রোসাঙ্গ রাজসভার আশু প্রভাব
সপ্তম অধ্যায়—সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ
পরিশিষ্ট—দোনাগাজী

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা বিচিত্র। সে-সম্পর্কে 'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' রচনার পূর্ব পর্যন্ত যে-সব গবেষণা হয়েছিল তা এ-সাহিত্যের

বিকাশের মোটামুটি পরিচয়। এর সম্যক রূপ তাতে ফুটে ওঠেনি। এ গ্রন্থের লেখকদ্বয়ের বক্তব্য : 'এ বিষয়ে বাঙ্গালীর গবেষণা করিবার অবকাশ বা সুযোগ বেশী নাই বটে, কিন্তু ইহার ক্ষেত্র এতই প্রসারিত যে, বহু পণ্ডিত বহু বর্ষ ধরিয়া একাজে লিপ্ত থাকিলেও, ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিতে পারেন কিনা, বলা যায় না।' রোসাঙ্গ রাজদরবারে বাংলা সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আলোকসম্পাৎ করে ডক্টর হক বাংলা সাহিত্যের এক অজ্ঞাত পরিচয় উদঘাটন করেছেন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অজ্ঞাত-সম্পদের আবিষ্কারের পথ উন্মোচন করেছেন। এ গ্রন্থ বাংলাদেশের বাইরে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলেও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে অনুসন্ধানের সূচনা করেছেন তা গৌরবময়। গ্রন্থখানি শুধু অজ্ঞাত কবি-পরিচয়ই নয় সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় মুসলিম সমাজেরও পরিচয়। কাব্য-সাহিত্য যে-জীবন ও সামাজিক পরিস্থিতিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তার পরিচয় ছাড়া সংশ্লিষ্ট আলোচনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে—আলোচ্য গ্রন্থ গবেষণার সেই মূল্যবান পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। যখন বাংলা সাহিত্যে পদ্ধতি-গত গবেষণার সুবলয়িত রূপ সৃষ্টি হয়নি, তখনকার এ-কাজ অবশ্যি প্রশংসার যোগ্য। প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন কীর্তি এবং ঐতিহ্য অনুসন্ধান জাতীয় জাগরণ তথা অগ্রগতির লক্ষণ। এমন প্রয়াসের মধ্যে যেমন আছে সাহিত্য প্রীতি, তেমনি আছে সাজাত্যপ্রীতি ও স্বদেশ প্রেম। জাতির অতীত গৌরবকে তার সামনে উন্মোচিত করলে তার প্রাণে জাগে গৌরববোধ, প্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিমের এ সাধনা তাই গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাইরে বাংলাভাষার চর্চা বাঙালির তথা বাংলা সাহিত্যের জন্য গৌরবের ব্যাপার। 'আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে রোসাঙ্গ রাজসভার পরিচয় দান করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সে সভার অর্থাৎ সেখানকার রাজা ও রাজ-অমাত্যদের পরিচয় হয়েছে খুবই প্রাসঙ্গিক। রোসাঙ্গ রাজসভাকবির প্রসঙ্গে লেখক প্রথমেই দৌলত কাজীর ব্যক্তি ও কবি পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর মাগন ও আলাওলের কাব্য সাধনার পর্যালোচনা করে বলেছেন যে : '১৬২২ হইতে ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ মাত্র ছয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের যে সর্বতোমুখী বিকাশ সাধিত হয়, তাহার তুলনা বাঙ্গালা ভাষার আপন গৃহে মিলে না'।[৪]

এ-গ্রন্থ বিষয় ও পর্যালোচনা উভয় দিক থেকে নতুন' এ কাজ যেমন পথিকৃতের তেমনি বিশেষজ্ঞের। আব্দুল করিম সংগৃহীত দৌলত কাজীর 'সতীময়না' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেছেন 'যতদিন বঙ্গ সাহিত্য বাঁচিবে, ততাদন কবি দৌলত কাজীর সুখ্যাতি অটুট থাকিবে।'[৫] এ মন্তব্যের সার্থকতা উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে সেকালের প্রায় সব কাব্যই অনুবাদ, অনুবাদ-নির্ভর বা পৌরাণিক আখ্যান-নির্ভর। মৌলিক রচনার পরিচয় খুব-একটা পাওয়া যায়নি——এ ক্ষেত্রে কোরেশী মাগন ঠাকুরের (মৃত্যু ১৬৩০ খ্রী.) 'চন্দ্রাবতী' কাব্য একটি বিরল উদাহরণ। লেখক বলেছেন :

> প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মৌলিক কাব্যের একান্তই অভাব। মাগন ঠাকুরের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এ দীনতা আংশিকভাবে ঘুচিয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই জন্য বাঙ্গালা সাহিত্য এই রোসাঙ্গ প্রবাসী কবির নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।[৬]

আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত ব্যাপার—এই যে মাগন ঠাকুর মহাকবি আলাওলের সাহায্যদাতা ও কাব্যসাধনার সহায়ক ছিলেন। এ-অর্থে মাগনকে

'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক' বলা চলে। মাগন চট্টগ্রাম জেলার অধি-বাসী, তিনি আরবি-ফারসি, বর্মি ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত; এবং পারদর্শী ছিলেন ভৈষজ্য ও যাদু বিদ্যায়। ডক্টর হক পরিবেশিত এসব তথ্যের অনুকূলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই—তবে 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে তাঁর ভাষাজ্ঞানের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আলাওল সম্পর্কে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রথম আলোচনা করেন।[৭] ডক্টর হক আলোচ্য গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্যই সংযোজন করেছেন। কিন্তু কবির জন্মভূমি চট্টগ্রাম এ প্রমাণে কোন দ্বিমতের আলোচনা করেননি, এমন কি ১৯৫৭ সালে তৎ-প্রণীত 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে'ও সে মতে অটল আছেন।[৮] আলাওলের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো দৌলত কাজীকে বাদ দিলে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে তাঁর মত প্রাতিভাবান পণ্ডিত আর দ্বিতীয়টি জন্মেনি।[৯]

আলোচ্য গ্রন্থের রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান সমাজ অধ্যায় দুটি গভীর বিশ্লেষণধর্মী। রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন, যথা—ধর্মসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের নির্বাসন, বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের আমদানি, পূর্ববঙ্গীয় উপাদানে কাব্য সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যে ফারসি সুকুমার সাহিত্যের আমদানি, সাহিত্য থেকে একঘেঁয়েমি বিলোপ ও বৈচিত্র্যের আমদানি, সাহিত্যের নতুন আদর্শ মানবীয় প্রেম প্রবর্তন। অতঃপর ডক্টর হক বলেছেন: 'উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে বাংলায় উপন্যাস রচিত হইবার পূর্বে, মানুষের প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য রচনা করিবার আদর্শ সর্ব প্রথম রোসাঙ্গ হইতে এদেশে আগমন করে'।[১০]

ডক্টর হকের এ-মন্তব্যের সমান্তরাল মন্তব্য পরবর্তীকালে অনেকবার শোনা গেছে। রোসাঙ্গের কবিদের এই মানবীয় চেতনা বাংলা কাব্যে নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'এ দেশের হিন্দুগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন, পালন ও রক্ষাকর্তা বাংলার মুসলমান' (পৃ. ৬৭)। এ মন্তব্যের সঙ্গে সর্বৈব একমত হওয়া যায় না। হিন্দুরা যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা তা পুরো সত্য নয়—'বাংলা ভাষা' অনেক বিবর্তনের ফল; বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদগুলোর স্রষ্টা বৌদ্ধ-সাধকগণ একথা বহু আলোচিত এবং এ ভাষার লালনেও বৌদ্ধ অবদান স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের যে ব্যাখ্যা লেখক দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক সত্য।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য যে নতুন আদর্শ ও চেতনার জন্ম দেয় তার প্রভাবও হয়ে উঠেছিল 'বৈদ্যুতিক শক্তির' মতই। মরদন (১৬০০-১৬৪৫), শমসের আলী, মোহাম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০), মোহাম্মদ রাজা, আবদুল হাকীম প্রমুখ কবির কাব্যে এর আশু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্যি পশ্চিম বঙ্গের কবিদের উপর এ-প্রভাব পড়েনি।

গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে, রোসাঙ্গ রাজসভা কবিদের কাব্যে, সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবন কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গের কবিরা সেকালে কাব্য রচনা করেছেন। আরাকান চট্টগ্রাম এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গের মুসলমান কবিদের কাব্যে দেশের ধর্ম-সমাজ-জীবন আচরণ ও পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের প্রভাব হিন্দু সমাজে পড়েছিল কিন্তু

মুসলিম সমাজও হিন্দু প্রভাব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। সেকালের কাব্যে সুফি প্রভাব আছে—অধিকাংশ কাব্যে পীরপ্রশস্তি ছিল। ইসলামে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের স্থান না থাকলেও কোন কোন কাব্যে তা দেখা যায়; যেমন—মরদন তাঁর 'নছিরানামা' কাব্যে বলেছেন :

দেখ দেখ জার জেই আছে কর্ম্মভোগ।
সেই মতে কর্ম্ম ফলে ভুঞ্জে দুখ সুখ।। (পৃ. ৯৪)

বিবাহ ব্যাপারে ইসলামী শাস্ত্র বিধির শিথিলতা লেখকদ্বয় বহু কাব্যেই লক্ষ্য করেছেন। মুসলমান নায়ক এবং হিন্দু নায়িকার প্রণয় বহু কাব্যেরই উপজীব্য। বিবাহ আচার হিসেবে মেয়েদের মঙ্গলধ্বনি, হাতে প্রদীপ, মাথায় কলসি, নাচগান, করতালি ইত্যাদি দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। সেকালে মেয়েরা কপালে সিঁদুর বিন্দু পরিধান করতেন এবং চন্দন ফোটার ব্যবহারও দুর্লক্ষ্য ছিল না।[১১] মেয়েরা ঝরকা, নোলক, দুল, বেসর, নৎ, গজমতি, তেলরী, বাজুবন্দ, বলয়, খাড়ু, নেপুর (নূপুর) ইত্যাদি অলঙ্কার এবং সেহেরা, কাঁচলী, পাট্টা, কোর্ত্যা, কাবাই শাড়ী ইত্যাদি পোষাক পড়তেন। মুসলমান সমাজে বর বরণ (মেয়েরাই সাজসজ্জা করে, ধানদুর্বা নিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে বর বরণ করতেন); বেলোয়াই (প্রাক-বিবাহ নিরীক্ষণ), অধিবাস, মঙ্গলঘট, শুভাশুভ, ভূতপ্রেত, জ্যোতিষ, শপথ ইত্যাদি কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কার পৈতৃকসূত্রে হিন্দু-বৌদ্ধ কাল থেকে প্রাপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ রোসাঙ্গ রাজসভার এবং তৎপ্রভাবে সৃষ্ট বাংলা কাব্য থেকে এইভাবে সমকালীন জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে গ্রন্থখানি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। তাঁদের গবেষণায় মধ্যযুগীয় বাঙালি সংস্কৃতির একটি মিশ্র রূপ পাওয়া যাচ্ছে। বৌদ্ধ হিন্দু পরিবেশে ইসলামের প্রসার এ-মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন—এ ব্যাপারে উগ্রতা এবং গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে নেই বলেও আমরা মনে করি কিন্তু 'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থে 'বর বরণ', 'অধিবাস', 'শুভাশুভ', 'প্রণাম', 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি রেওয়াজকে বলেছেন 'কুসংস্কার'।

ডক্টর হক এবং সাহিত্য বিশারদের ইতিহাস ব্যাখ্যাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার অবকাশ আছে। ইসলাম যে-সব দেশে প্রসার লাভ করেছিল সে-সব ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্য একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। ইন্দোনিশিয়ার নাম করণ, ইরানের 'নওরোজ' উৎসব ইত্যাদি। বাংলাদেশের বেলায় দেশজ আচরণ যা মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল এবং আছে তাকে নির্বিচারে কুসংস্কার বলা যায় কিনা সেটা একটি প্রশ্ন। ডক্টর অসিতকুমার ব্যানার্জি মধ্যযুগের কবি মোহাম্মদ আকবরের 'জেবুলমুলুক শামারোখে' জেবুলমুলুক ও রতিকলার বিবাহ এবং দোনাগাজীর 'সয়ফুল মুলুক' কাব্যে নায়িকার প্রাক্ বিবাহ স্নানের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিন্দু আচরণের সাদৃশ্য বোধ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে ডক্টর ব্যানার্জি স্বীয় মত প্রকাশ করে বলেছেন :

> রাজনৈতিক ও সামপ্রদায়িক কারণে আধুনিক যুগে অনেক মুসলমান লেখক বাঙলার সাধারণ মুসলমানের এই হিন্দু-ঘেঁষা আচার-আচরণকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে আরবী-ফার্সী কেতাবের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে।[১২]

লেখকদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন : 'বাঙ্গালার মুসলমানেরা সে যুগে বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়া, এই ভাষা চর্চার মধ্য দিয়া, একটা বিরাট জাতীয় সাহিত্য স্থষ্টির প্রয়াস পাইতেছিলেন, সেই যুগে পশ্চিম বঙ্গে মুসলমান নিদ্রিত (পৃ. ৮৯)'। কথাটা একেবারে কারণহীন নয় তবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা বাংলা ভাষার জন্য কিছু করেননি একথা যেমন সত্য নয় তেমনি এ-ও সত্য নয় যে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানেরা বিদেশী (আরবি-ফারসি-উর্দু) ভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর 'নূরনামা' গ্রন্থে 'জে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী' সে সবের উদ্দেশ্যে যে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তারা নিশ্চয়ই 'বাঙ্গাল' মুসলমান। পশ্চিম বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তথা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশী থাকাটা স্বাভাবিক এবং পূর্ববঙ্গে যেহেতু ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রভাব অথবা কোন ধর্মেই কঠিন বন্ধন প্রাক্-তুর্কি আমলে ছিলনা, সেকারণে ইসলাম ও দেশী ভাষা আপন প্রভাব বিস্তারের একটি উর্বর ক্ষেত্রে পেয়েছিল সেখানে। এটা কেবল নবাগত ধর্মের গুরুত্বের ব্যাপার নয় সমাজতাত্ত্বিক কারণও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সক্রিয়।

'আরকান-রাজসভায় বাঙ্গলা সাহিত্য' একটি মূল্যবান গ্রন্থ—এটি অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচায়ক হলেও অনুসন্ধান নিরাবেগ নয়। তবু মধ্যযুগীয় মুসলিম সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারার উপস্থাপনা হিসেবে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের পিএইচ. ডি. থিসিস 'A History of Sufi-ism in Bengal' দীর্ঘকাল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নি। থিসিস হিসেবে গৃহীত হবার প্রায় ৪১ বছর পর ১৯৭৬ সালে তা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। কি কারণে গ্রন্থখানি প্রকাশে এই বিলম্ব সে প্রশ্ন অবান্তর নয়।

'History of Sufi-ism in Bengal'-বিষয়ে গবেষণা করবার পর একই বিষয়ে বাংলা এবং ইংরেজিতে ডক্টর হক একাধিকগ্রন্থ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। সেগুলো হলো :

গ্রন্থ :

১ বঙ্গে সূফী প্রভাব, মোহসীন এণ্ড কোং, ৬৬/১এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ১৯৩৫
২ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা ১৯৪৮
৩ Muslim Bengali Literature (করাচী)

প্রবন্ধ :

১ বঙ্গে সূফী প্রভাব প্রবেশের ধারা, মোহাম্মদী, ৬:৮, ৬:৯ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৪০
২ পাঁচ পীর সমষ্টি, মোহাম্মদী, ৮:১ কার্তিক ১৩৪১
৩ মখদুম শয়খ জালালু-দ্-দীন তব্রীজী, ঐ ৮/৩ পৌষ ১৩৪১
৪ বঙ্গে ইসলাম বিস্তার, ঐ, ১৩৪৩-১৩৪৪ ১০/১-১০/৯ মোট ৯ সংখ্যায়
৫ Impact of Islam on the Gaudian form of Vaishnavisim, JASP, Aug. 1968
৬ Panch Pir, JASP Aug. 1970

এ ছাড়া 'চাটিগাঁর মুসলিম সংস্কৃতি' (বুলবুল, ৪:৯ পৌষ ১৩৪৪), 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' ইত্যাদিতেও সে-মূল উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব রচনা প্রকাশের পর মূল গ্রন্থ

প্রকাশের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল কিনা এ-প্রশ্ন হয়তো তাঁর মনে জেগেছিল; দ্বিতীয়ত তাঁর অতিসন্দর্ভের সকল বক্তব্য সময়ানুকূল ছিল কিনা এ-ও অবহেলার প্রশ্ন নয়, তৃতীয়ত অসম্ভব কর্ম-ব্যস্ততা ও স্থান পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাও তাঁকে এত বড় গ্রন্থ-প্রকাশে উৎসাহ যোগায়নি।

বর্তমান আলোচনায় আমরা কালানুক্রমিক ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম—কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে 'বঙ্গে সূফী প্রভাব', 'A History of Sufi-ism in Bengal' এর পরে—প্রকাশ কালের দিক থেকে আগে। সুতরাং প্রকাশ ক্রমে 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' এর আলোচনার দাবি আগে। তবে আমরা তা করছি না কারণ দু'খানা গ্রন্থের উপাদান এক, এবং এ-ক্ষেত্রে History of Sufi-ism মূল—'বঙ্গে সূফী প্রভাব' তার অনুবাদ-নির্ভর সংক্ষিপ্ত রচনা অথবা একই উপাদান নিয়ে একই বক্তব্যের ভিন্ন শৃঙ্খলায় উপস্থাপনা।

'বঙ্গে সূফী প্রভাব' আট অধ্যায়ে বিভক্ত, পক্ষান্তরে A History of Sufi-ism in Bengal চৌদ্দটি মূল অধ্যায় এবং তিনটি পরিশিষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। ডক্টর হক বাংলায় সুফিবাদ সম্পর্কে গবেষণার পথিকৃৎ। মানবজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি গভীর কৌতূহল তাঁকে বঙ্গে সুফিবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুশীলনে অনুরাগী করে তোলে। এই স্বভাবানুরাগ তাঁর গবেষণা বিষয় নির্ধারণের প্রেরণা। বিষয়ের আভাস দিতে গিয়ে ডক্টর হক বলেছেন:

The main theme of my book is to show, how Islam under the grab of Sufistic Movement, which were in their full swing up to the sixteenth century A.D. in India, entered Bengali and how it under went many momentous changes in the hands of the Bengali Sufis and the Bengali Muslims affiliated to the different schools of Northern Indian Sufi thought. ১৩

বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলাম, তাঁর মতে, হজরত মুহম্মদ বা তাঁর সুযোগ্য চার খলিফার কালের ইসলাম নয়। বস্তুত এ দেশের ইসলাম পুরোপুরি না হলেও মুখ্যত সুফিমতবাদ-ভিত্তিক। তিনি মনে করেন বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তম শতাব্দীর পর বাংলার সুফিবাদ নতুন পথে চলতে আরম্ভ করে, তাতে করে তার আদি বিশুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্যই শুধু নয় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, শক্তি ও চরিত্র হারাতে থাকে।

With the loss of these, Sufi-ism in Bengal, became identical in many respects Tantrikism, Yogism, Nathism and other similar systems of indegenous thought and asceticism. ১৪

বঙ্গে সুফিবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডক্টর হক সুফিবাদের প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদান করেছেন। ভারতীয় সুফিদের মূল ধারণা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তাঁদের লক্ষ্যই হলো 'ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন' (complete union with God); তাঁদের বিশ্বাস ও আচরণে লক্ষ্য করা যায় যে আল্লাহ থেকে মানুষের দূরত্ব অনেক, ঈপ্সিত মিলনের জন্য এই দূরত্ব অতিক্রম করে যাবার সাধনা-পথ হলো 'তরিকৎ' এবং মিলনকামী পথিক হলো 'সালিক'।

অতঃপর ডক্টর হক আলোচনা করেছেন 'সুফিবাদের উপর ভারতীয় প্রভাব' সম্পর্কে। তাঁর মতে বৌদ্ধ ধর্ম অন্যান্য স্থানের চেয়ে মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ার ইসলামের উপর

বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রধানত, বুখারা, সমরখন্দ, তুর্কিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে ইসলাম ও সুফিভাব প্রচারিত হয়েছিল সে কারণে ভারতীয় মুসলমানেরা এ সব দেশের ধর্ম পুরুষ (Saints)-দের উপর বিপুল আস্থা পোষণ করতেন। ভারতীয় সুফিবাদ গোঁড়া ইসলামী তৌহিদ-বাদ থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু উপনিষদীয় 'আত্মা' তত্ত্ব থেকে সুফিদের 'রুহ্'-তত্ত্ব খুব বেশি দূরবর্তী নয়। ভারতীয় সুফিদের মধ্যে যে চরম নৈরাশ্যবাদী ধারণা বিদ্যমান তার কারণ বৈদান্তিক-প্রভাব। শঙ্করাচার্য প্রচার করেছিলেন, ব্রহ্ম সত্য আর সবই মায়া। অন্যদিকে সুফিদের 'ফানা' ও 'বাকা' বৌদ্ধদের 'নির্বাণ'-তত্ত্বের সদৃশ। ডক্টর হক মনে করেন যে 'ফানা'-তত্ত্ব ভারতীয় প্রভাব জাত। সুফিদের মন-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও ভারতীয় যোগশাস্ত্র ভিত্তিক। ডক্টর ইকবাল বলেছেন যে Sufi cultivation of olatifa, as a practice wholelly based on the un-Islamic principle and borrowed from the Hindus of India.[১৫]

আলোচ্য গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ডক্টর হক বঙ্গীয় সুফিবাদের ভূমিকা দান প্রসঙ্গে বলেছেন সুহরাওয়ার্দী, চিশতি, কলন্দরি, মাদারি, আদহামি, নক্শবান্দ, কাদেরি গোত্রের সুফিরা এখানে আগমন করেছিলেন। এঁরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সাধনা ও প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এ-সব কেন্দ্রের মধ্যে বরেন্দ্র, রাঢ়, বঙ্গাল-বঙ্গ, চট্টলা ছিল প্রধান। বরেন্দ্র কেন্দ্র গৌড় থেকে দিনাজপুর ; রাঢ় কেন্দ্র মঙ্গলকোট ; বঙ্গাল-বঙ্গ ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর ; চট্টলা কেন্দ্র চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। সপ্তম থেকে দশম এই চারটি অধ্যায়ে সুফি দরবেশগণের আগমন, তাঁদের জীবনী, প্রচার কার্যের বাধা-বিপত্তি ও সাফল্য-অসাফল্য, অলৌকিক কার্যাবলী ইত্যাদির ঐতিহাসিক বর্ণনা আছে। এ-ইতিহাস রচনায় ডক্টর হক প্রথম পথিক তাই তাঁর কাজ সর্বত্র নির্ভুল ও তথ্যভিত্তিক হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। সুফিদের জীবনেতিহাসের প্রামাণ্য দলিলপত্র সর্বত্র পাওয়া যায়নি। তাই যেখানে দলিল পত্র পাওয়া যায়নি সেখানে তাঁকে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যেমন চট্টলা-কেন্দ্রের সুফি-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ধরে নিয়েছেন যে চট্টগ্রামে বায়েজিদ বোস্তামির মাজার আছে। এ ধারণার আপাতত দুটি কারণ : ক. লোকে বিশ্বাস করে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৫ মাইল উত্তরে নাছিরাবাদ গ্রামে টিলার উপরে তাঁর মাজার আছে, খ. দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকায়, নুরুন্নাহার ও কবরের কথা অংশের, 'নাসিরাবাদেতে মানি সাহারে সুলতানা / দেশবৈদেশে হৈতে আইসে মমিন মুসলমান' ছত্রগুলো।

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই এ-প্রসঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন--এঁরা মনে করেন বায়েজিদ বোস্তামি কখনোই ভারতে আসেন নি। তাঁর ভক্তদের মধ্যে কেউ-কেউ সম্ভবত এসেছিলেন। তিনি খোরাসানের মানুষ ছিলেন---সেখানে 'কাউনিয়া নামক স্থানে তাঁর সমাধি আছে।

বাঙ্গাল-বঙ্গ কেন্দ্রের প্রখ্যাত সুফি শাহজালাল ডক্টর হকের মতে ইয়েমেন থেকে দিল্লী আগমন করেন এবং নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সংবর্ধনা লাভ করেন। তাঁর শুভেচ্ছা নিয়ে বাংলায় এসে ইসলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। দেড় শ' বছর বয়সে সিলেটে তাঁর মৃত্যু হয় ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে। তাঁকে 'মোজাররাদী ইয়েমেনী' বলার পেছনে যুক্তি হলো তিনি ছিলেন চিরকুমার এবং ইয়েমেনের অধিবাসী। তিনি চিরকুমার হলেও ইয়েমেনী ছিলেন এ মতের বিপক্ষে কথা আছে---কেউ-কেউ মনে করেন শাহজালাল ইয়েমেনের লোক ছিলেন না ; তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের মানুষ। তিনি সুহরাওয়ার্দী মতের সুফি ছিলেন একথাও প্রশ্ন-সাপেক্ষ কারণ তুর্কিস্তানে তখনো সুহরাওয়ার্দি-সাধনাপদ্ধতির প্রচলন হয়নি।

ডক্টর হক সুফিদের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ নয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে সচেতন। 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন :

....heardly there is a Muslim village or hamlet in the country, which does not contain a tomb of a known or unknawn saint, pir or preacher.[১৬]

সুফির 'ফানা-ফিল্লাহ্' তত্ত্ব চৈতন্যদেবের জীবনের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে ডক্টর হক মনে করেন। তাঁর মতে সুফি তত্ত্ব ও বৈষ্ণব তত্ত্ব উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য বিদ্যমান—এই সাদৃশ্যের কারণ হলো উভয় মতই সর্বেশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে উপনিষদ থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল :

> The cause of such similarity is—both of them drew inspiration from the Upanishads for its pantheistic development in Persia and India while Bengali Vaishnavism is indebted to the Upanishads for both of its pantheistic and monotheistics development.[১৭]

বৈষ্ণব দর্শনের 'রাধা' এবং সুফী দর্শনের 'সাকি' মূলত একই। বৈষ্ণব ধর্মবিদরা 'রাধা' এবং 'কৃষ্ণ'-কেও একই সত্তা মনে করেন, তারা এক ভগবানের দুই নাম। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন: 'রাধাকৃষ্ণ যৈছে সদা একই স্বরূপ'/ লীলারস আস্বাদিতে ধরে নানারূপ'। পারশ্য এবং ভারতীয় সুফী সাহিত্যের মতই বিপুল বৈষ্ণব সাহিত্যেরও মূল উপজীব্য প্রেম—এ-প্রেম নরনারীর রোমাণ্টিক হৃদয়াবেগ বা মাতাপুত্রের বাৎসল্যবোধ নয়, তবু সাহিত্যে তার প্রকাশের নিমিত্ত আবেদনমূলক বাক্-বিধি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।[১৮] 'রাধা'=প্রেম বা Love Devine অমূর্ত ধারণাকে তার কোন না কোন মূর্ত (Concrete) আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছে। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে বাঙালি বৈষ্ণবগণ তূরীয়-প্রেম ধারণাকে এ ভাবে প্রকাশ করে নি তাই, এ-রূপকাশ্রিত সুফি প্রভাব বলতে বাধা নেই। উভয় মতের কতিপয় মূল তত্ত্বের পারিভাষিক সাদৃশ্য নিম্নরূপ :

সুফি	বৈষ্ণব
ইশ্‌ক্-ই-হাকিকী	প্রেম (Love Devine)
রাধা	সাকি
সমা	কীর্তন
হাল	দশা
ফানা-ফিল্লাহ্	মিলন
গজলিয়াৎ	পদাবলী
হিজরন	বিরহ

ডক্টর হক মনে করেন 'কীর্তন' 'জিক্‌র্'-এর, 'দশা' 'হালের' এবং 'মিলন' 'ফানা'র প্রভাবজাত। এমন কি বৈষ্ণব পদাবলীও সুফিকবিদের সমা বা রুবাঈ-র প্রভাবজাত। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এ-মতের সমর্থক। ডক্টর হক তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থেও বলেছেন :

> সূফীদের 'সমা' ও বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে'ও কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয়, তাহাতে যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে সূফীদের 'হালে'র অবস্থাও তাহাই। ···গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম', সূফীদের 'ইশ্‌ক্'। রাধা-কৃষ্ণ সুফীদের সাকী ও বুৎ কিংবা শমআ ও পরওয়ানা; ঐশ্বর্য সূফীদের কিয়ামৎ ছাড়া কিছুই নহে।[১৯]

সুফিরা সামাজিক অসাম্য, ধর্মের নামে পীড়ন এবং সংকীর্ণ ভেদাভেদ দূর করবার জন্য বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করলেন উচ্চকণ্ঠে— এ-বাণী চৈতন্যের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এবং তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচারের সময় জাতিভেদ, বর্ণভেদ ভুলে গিয়ে মুসলিম, চণ্ডাল এবং অন্যান্য নীচ জাতির লোকদের স্থান দিলেন তাঁর সত্য-ছায়াতলে। সুফিবাদের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক এ-উভয় চরিত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাম্প্রতিক গবেষকদের মধ্যে কেউ-কেউ, বিশেষত ডক্টর অসিত কুমার ব্যানার্জি বৈষ্ণব ধর্মের উপর সুফিবাদের এই প্রভাব স্বীকার করতে চান না— তাঁর মতে এগুলো 'সাদৃশ্য'।[২০] বিষয়টি সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার ডক্টর হকের সমর্থনে বলেছেন :

> আধুনিক প্রচলিত হিন্দু ধর্মের মধ্যে তাহার শিরায় শিরায় যে সূফী ভাবধারা ঝঙ্কৃত তাহা আপনি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু-মুসলিম-মিলন-প্রয়াসী সকলেই উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। Sufi-ism in Bengal অংশটি নূতন তথ্যের একটি সম্পুট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে তসওউফ বিদ্যমান, আমি তাহা স্বীকার করি। (অন্যান্য কথার মধ্যে বহু পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত ''দশা'' শব্দের যে একটি নূতন অর্থ, চৈতনোত্তর বাংলায় দেখা দেয়, বৈষ্ণব কীর্তনের সময়ে গায়কের ভাবাবেশে সমাধির মত সংজ্ঞালোপ তাহা সূফী (হাল) শব্দের প্রতিশব্দরূপেই বাঙলাদেশে গৃহীত হয়, এই অর্থ আদৌ সংস্কৃতে ছিল না, ভারতের অন্যত্রও এই অর্থ অজ্ঞাত)।[২১]

বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুফিদের প্রভাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে ডক্টর হক সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তুর্কিরা তাঁদের শৌর্য বীর্য দ্বারা এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রবর্তনের ফলে তাঁদের প্রজাগণের মনে জন্মেছিল এক প্রকার হীনমন্যতা। সুফিরা সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের মাধ্যমে হিন্দু মুসলমান উভয়ের মন থেকে তা বিদূরিত করেন। তাঁদের আস্তানা এবং খানকায় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মিলিত হতেন— পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ববোধের ফলে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠেছিল। এই উদার-মিলন ও প্রশস্ত-ভিত্তির উপর বহু নতুন ধর্মমতের জন্ম হয়। সত্যপীর, মানিকপীর মতবাদ এখনো প্রচলিত আছে। এ সব মত হিন্দু-মুসলিম মিলনের সূত্র হয়ে উঠেছিল। এদেশের বাউল মত ও তত্ত্বেরও জন্ম, ইসলাম এবং সুফিদের প্রভাবের ফল :

> Influence of Islam in general and of Sufi-ism in particular was one of the leading factors that led to the growth of Baul Mysticism in Bengal.[২২]

লেখক মনে করেন, সুফিদের 'ফানা ফিশ-শায়খ' তত্ত্বই পরবর্তীকালে গুরুভজনা বা মুরশিদ ভজনার জন্ম দিয়েছে।[২৩] কিন্তু ব্যাপারটার ভিন্ন কারণও থাকতে পারে—। হিন্দু ধর্মের গুরুবাদই বাংলার মুসলিম সমাজে মুরশিদ চেতনা বা পীরবাদের জন্মের জন্য প্রধানত দায়ী। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে বাউল সাধনা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চলছে, এ ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ আলোচনা ছিল পথিকৃৎ। বাউল প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ডক্টর হক বলেছেন, বাংলাদেশ কোন কোন প্রখ্যাত আধুনিক লেখককেও ভুলে যেতে পারে কিন্তু সে কখনোই কোন প্রকৃত বাউলের গানকে ভুলবে না।

এ-গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের (Growth of Popular Islam in Bengal) সঙ্গে 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় "বঙ্গে লৌকিক ইসলামের উদ্ভব"-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশে এসে ইসলাম এদেশের সাংস্কৃতিক প্রভাবে পড়ে নতুন রং-রূপ লাভ করেছিল সে বিষয়ে লেখক যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক অধ্যয়নের প্রবেশিকা-তত্ত্ব হলো এই যে সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠ সেমেটিক আরবীয় ধর্ম আর্য-ইরান, হিন্দু-ভারত অ-আর্য বাংলা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিয়ে সুগভীর পরিবর্তন লাভ করেছে। গোঁড়া মুসলমানরা বাংলায় ইসলামের এ-পরিবর্তনকে বেদাত এবং শিরক বলেছেন। এই বৈশিষ্ট্যকেই ডক্টর হক বলতে চেয়েছেন 'লৌকিক ইসলাম' বা 'পপুলার ইসলাম'।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে ধর্মান্তরিত বাঙালি বা ভারতীয় মুসলমানগণ নাম, সংস্কার, বিশ্বাস, নানাভাবে, নানা আকারে রক্ষা করে চলেছে অথবা আরবি জীবন আচরণকে বাংলায়িত করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ, লেখক বলেছেন, নামের ক্ষেত্রে আরবি শব্দ বাংলা রং লাভ করেছে—যেমন আরবি আয়েশা বাংলা আশা ; তেমনি কুলসুম কুসুম, গুজা গুয়জ বা সুরুজ ; পীর বখশ (ফারসি) পীরু ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত লালমিয়া (=Red অর্থে)=লাল অর্থে কৃষ্ণ ; বাঁশী (বাদ্যযন্ত্র=কৃষ্ণ-চেতনা) কেন হয়েছে সে ব্যাখ্যা লেখক দেন নি। এ-সব নাম মুসলিম সমাজে অবিকৃতরূপেই থেকে গেছে। লোককাহিনীর মালঞ্চ মালা, শীত বসন্ত, কাঞ্চনমালা, মধুমালা ইত্যাদি কেচ্ছার কথক এবং শ্রোতা মুসলমান কিন্তু এগুলো প্রকৃতই বাঙালি ঐতিহ্য আগত। এদের মূলে আরবি-ফারসি প্রভাব নেই। পীর-পরস্তী বা পীরবাদ বা গোরপূজা ইসলাম-পূর্ব যুগীয় বা প্রচলিত হিন্দু—বা দেশীয় 'গুরুভজা' প্রথা থেকেই উদ্ভূত। পীর অর্থ বৃদ্ধ লোক ; বৌদ্ধ-শব্দ 'থেরো' মানেও বৃদ্ধলোক। এ থেকে মনে হয় বৌদ্ধ-তুর্কিগণ যখন একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করে তখন তারা তাদের প্রাচীন রীতি এবং বিশ্বাসকে নতুন নামে চালু রাখে। আফগানিস্তান এবং তুর্কিস্তানের কোন কোন অংশে 'গোর-পরস্তি' প্রথা বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইসলামের বিধানে এ ধরনের কোন আচরণের উল্লেখ নেই। 'তোবাররক' হিন্দু ধর্মের 'প্রসাদ'-এর অনুকরণ ; শিরনি, উরস, জটা ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, বস্তুত এ-সব দেশজ ঐতিহ্যেরই অনুসরণ। পীরবাদ এমন সীমা ছাড়া পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাকে কুসংস্কার না বলে উপায় নেই কিন্তু সবই হচ্ছে ইসলামের নামে। যেমন ঘোড়াপীর, নেংটাপীর, তেনাপীর, জুমাপীর (বাণিজ্যিক কল্যাণের পীর), পাঁচপীর (পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চ সতী, পঞ্চ নদ) সর্বভারতীয় হিন্দু ধারণার ফল। খোয়াজ খিজির (ভারতীয়= বরুণ=জলদেবতার প্রভাব জাত ধারণা), সত্যপীর গাজীমিয়া (আরণ্য শাপদ থেকে নিরা-পত্তা দাতা) ইত্যাদির প্রবল প্রভাব ছিল এককালে। অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ওলা বিবি, মনসা, শীতলা ইত্যাদির প্রভাব আদিম বিশ্বাসের ফল। মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ আসলে হিন্দু সমাজের দ্বিজ-শুদ্র শ্রেণীভেদের প্রভাব। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে, পণ গ্রহণ, গাত্র হরিদ্রা, সাধ ভক্ষণ, ইত্যাদি আচার-আচরণও দেশজ ঐতিহ্যের প্রভাবজাত। এই সব অনৈসলামিক প্রথা ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মাধ্যমেই যে বাংলায় ইসলামে প্রবেশ করেছে তা নয় ;—ধর্মান্তরিত নয় এমন মুসলমানদেরও স্থানীয় প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে ডক্টর হক স্পষ্টই বলেছেন :

> ..it is also equally true that even those, who were not converts imitated many practices of their neighbours and were obliged to believe in certain local superstitions through the influence of their views, they took in the land. Again it should be borne in mind that a number of superstition and practices connected with them, were brought to Bengal even by the immigrants of the countries like Iran,

Samarkand, Bukhara and Afganistan and afterwards these flourished luxumitant in course of time on the soil of Bengal.২৪

গ্রন্থের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে বাংলা 'যোগ-সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সুফি-চেতনা, হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদির একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। কেশব রায়ের যোগকালন্দর, সৈয়দ মুর্তাজার (১৫৯০-১৬৬২) যোগ-কালন্দর, সৈয়দ সুলতানের (১৫৮০-১৬৪৮) জ্ঞানপ্রদীপ, আলী রাজার (১৬৯৫-১৭৮০) জ্ঞানসাগর ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাহিত্যের এ-ধারা গড়ে ওঠার পেছনে সুফি অবদান মুখ্য হলেও সুফি চিন্তা থেকে তা স্বতন্ত্র বর্ণরাগে সিক্ত বলেই ডক্টর হক একে যোগ-সাহিত্য নামে অভিহিত করেছেন। 'ভারতীয় সূফীভাব' এবং 'ভারতীয় ইসলাম' এ সাহিত্যের মূল উপজীব্য। একটি বিশেষ পদ্ধতির চিন্তা এবং একটি বিশেষ ধর্মবৈদেশিক প্রভাবে কী ভাবে তার গতি ও রূপের (course and colour) পরিবর্তন করে তার উজ্জ্বল পরিচয় এই শ্রেণীর সাহিত্য। এমন কি আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা (concept of God in Islam) পরবর্তী সুফিদের দ্বারা ভিন্ন অভিধা লাভ করেছে—তাঁকে তাঁরা বলেছেন 'পরমাত্মা', 'নিরঞ্জন', 'ঈশ্বর', 'শূন্য', 'ঠাকুর', 'গোঁসাঞি' ইত্যাদি। যোগ সাহিত্যের মাধ্যমে পরবর্তী সুফিদের কতকগুলো মূল তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, এগুলো হলো : স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মানবদেহের গুরুত্ব, নবী, গুরুতত্ত্ব, যোগ এবং যোগী। যোগ সাহিত্যের এ সব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন এগুলো সুফি, হিন্দু, বৌদ্ধ দর্শনের এক মিশ্ররূপ। এই রূপকে ডক্টর হক 'ভারতীয় সূফীবাদ' বলেছেন।

সুফিবাদ সম্পর্কে পৃথিবীর বহু মনীষী গবেষণা করেছেন। ডক্টর হক বিষয়ের স্বতন্ত্ররূপ ও বিচিত্র গতির পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চ্যাটার্জির এক কথায় অভিমত হলো : It is a great book। তিনি বলেছেন :

> সারা ভারতবর্ষে এবং বিশ্বের যে যে স্থানে ভারত বিদ্যা তথা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার চর্চা এবং আদর আছে সেই সব স্থানের পণ্ডিতেরা এই বইয়ের কদরদানী করিবেন।
>
> আমার কাছে তো এই বই একটি রত্ন-ভাণ্ডার বিশেষ। আমি বরাবরই আপনার ধর্ম-বিষয়ে উদারতা ও নিরপেক্ষতার এবং মানবিকতাবোধের অনুরাগী, আপনার এই সব গুণের ভক্তও বলিতে পারেন। এই গুণগুলি অসাধারণ, হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সহজে এ গুণ দেখা যায় না। ভারতের সূফী ধর্মকে, দারা সেকোহ্—এর কথায়, সত্যকার 'মজম-উ-বহরৈন' বলা যায়। আপনি সেই দিক দিয়া যে বিচার উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ, সুন্দর, সার্থক এবং সহৃদয়গণের চিত্তগ্রাহী। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে-ভাবে তসওউফ তাহার কায়েমী স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অজ্ঞাত, বাহিরের মানুষেরতো বটেই। সূফী মতবাদ— মূল ইরানে, মধ্য এশিয়ায় ও আরব দেশে—কিভাবে গড়িয়া উঠিল ভারতে এবং পরে বঙ্গভূমিতে এই মতবাদ ইসলামের সঙ্গে আসিয়া কিভাবে তাহার অভিনব ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিল, এত খুঁটি-নাটির সঙ্গে আপনার পূর্বে কেহ তো আলোচনা করেন নাই।২৫

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন "(A history of Sufi-ism in Bengal "। কিন্তু গ্রন্থখানি কেবলই 'ইতিহাস' নয় বরং ইতিহাস ও দর্শনের

সমাহার ; ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থিয়োসোফি ভিত্তিক উপাদান সমন্বয়ে একটি মৌলিক অধ্যয়ন। ভারতে ইসলামি অধ্যাত্মচর্চা সম্পর্কে তাঁর আগে কোন বাঙালি পণ্ডিত এমন প্রামাণ্য এবং পদ্ধতিগত গবেষণা করেন নি। উত্তরকালে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত (Obscure Religious cults as background of Bengali Literature), ডক্টর তারাচাঁদ (Influence of Islam on Indian culture), ডক্টর ইসহাক (Indian contribution to Hadith Literature), উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বাংলার বাউল) ইত্যাদি যে গবেষণা করেছেন তা ডক্টর হকের সাধনার উত্তরসুরি। ডক্টর হক যে-সময়ে গবেষণা আরম্ভ করেন তখন এদেশে গবেষণা পদ্ধতি (Methodology) গড়ে ওঠেনি। তাঁর সাধনায় কোন-কোন সমালোচক পদ্ধতির যে শৈথিল্য লক্ষ্য করেন তাকে আদৌ শিথিলতা বলা চলে কিনা সেটাই জিজ্ঞাস্য। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ মৌলিক, কোন সমীকরণ (assimilation) নয়; কোন দ্বিতীয় হাতের তথ্য-নির্ভর নয়; প্রামাণিক। কিংবদন্তী বা শ্রুতি সমর্থিত নয়; বস্তুগত। মূল-উৎস, দলিল এবং জরিপ-ভিত্তিক (Field-work) অধ্যয়ন; ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সঙ্গে ভৌগোলিক অভিক্ষেপ, সত্য-দর্শনের বৈজ্ঞানিক-চেতনা তাঁর সাধনায় সুশৃংখল অগ্রগতি দান করেছে।

বহু ভাষাবিদ, সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রাজ্ঞ, কোরান-হাদিস এবং বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম-চেতনায় পণ্ডিত মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর অভিসন্দর্ভে ব্যাপক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সুফিতত্ত্বের উদ্ভব, বিকাশ ও তার ভারতীয় প্রকৃতি বিশ্লেষণে তিনি তওহিদ-বাদী দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র, বাউল ও বৈষ্ণব তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম, বেদ-কোরান-উপনিষদ প্রভৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এই সব ধর্মমত ও দার্শনিক বিষয়ের আলোচনায় তিনি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। হিন্দু বা বৌদ্ধ দর্শন, বৈষ্ণব বা লোকায়ত দর্শনের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যেমন প্রসঙ্গ-সতর্ক থেকেছেন তেমনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ-বিশেষ ধর্ম বা দর্শনের যে পারিভাষিক বৈশিষ্ট্য আছে তা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে।

ধর্ম বিষয়ে উদার ও মানবিকতাবাদী ডক্টর হক মুক্তবুদ্ধির সমর্থক। বিশেষ করে সুফিবাদ এবং ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি আলো-আঁধার উভয় দিকের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রেখেছেন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সুফিদের জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যায় তিনি যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিবেশিক প্রভাব ব্যাখ্যায়ও তিনি নিরপেক্ষ ও নির্ভীক।

আলোচনায় সমাজতাত্ত্বিক নিরীক্ষা গভীর হলেও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অপূর্ণ রয়েছে বলে মনে হয়। বৈষ্ণব-পদাবলী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ রাজনৈতিক কার্যকারণহীন নয়। তেমনি বাউল-মরমীবাদের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন তা (The cause of establishment of Baul Mysticism in Northern Bengal seems to be the revival of Brahmanic religion among the Vaisnabs in later part of sixteenth century. p. 298-99) সত্য কিন্তু এর যে ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক কারণ আছে তা ডক্টর হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। আজকে যাঁরা বাউল মরমীবাদ সম্পর্কে ব্যাপক ও স্বতন্ত্র গবেষণা করছেন ডক্টর হক তাঁদের পুর্বসুরি; যাঁরা লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও লোকসাহিত্যের নানা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি তাদেরও পথ-প্রদর্শক। সুতরাং পদ্ধতি ও তুলনামূলক আলোচনায় সমস্যার গভীরে প্রবেশের সামর্থ্যে বাংলায় বিশেষভাবে মুসলিম সংস্কৃতি এবং সাধারণভাবে ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার দিক থেকে তিনি এক বিরল সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন। তথ্যের অভাবে, দলিলপত্রের দুর্লভতায়, প্রামাণিক

উপাদানের বিনষ্টির কারণে এদেশে সুফিতত্ত্বের ও সুফিদের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অথচ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য এই অধ্যায়ের উদ্‌ঘাটন ছিল জরুরি. মুহম্মদ এনামুল হক এ দুরূহ ও প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করে বাঙালির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'বঙ্গে সূফী প্রভাব'-'বঙ্গীয় মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের এক অধ্যায়' 'A History of Sufi-ism in Bengal' গবেষণার তথ্য ভিত্তিক রচনা। উপাদানের দিক থেকে তাই কোন স্বাতন্ত্র্য এ গ্রন্থের নেই কিন্তু মূল নিবন্ধ অপ্রকাশিত থাকা কালে এর যথেষ্ট মূল্য স্বীকৃত হয়েছে; দ্বিতীয়ত মূল অভিসন্দর্ভ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত হওয়ায় ইংরেজি-অনভিজ্ঞ বাঙালির কাছে এর আবেদন স্থায়ী হয়েছে। এ গ্রন্থের পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়	উপক্রমণিকা ১-১২ বঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা পরিবর্তনের মূলে সূফী প্রভাবই প্রধান, সূফীরাই বাঙ্গালার মুসলমান বিজেতা ও হিন্দু বিজিতদের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র।
দ্বিতীয় অধ্যায়	সূফীমতবাদের উদ্ভব ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৩-৩৫
তৃতীয় অধ্যায়	বঙ্গদেশ সম্পর্কে আবশ্যকীয় ভারতীয় সূফী মতবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ৩৮-৮৮
চতুর্থ অধ্যায়	বঙ্গদেশে সূফী প্রভাব প্রবেশের ধারা ৮৯-১১৯
পঞ্চম অধ্যায়	বঙ্গের কতিপয় ঐতিহাসিক সূফী ১২০-১৫৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	বঙ্গে সূফী প্রভাবের ফল ১৫৫-১৮২
সপ্তম অধ্যায়	বঙ্গে ভাবমিশ্রণ ও তাহার ফল ১৮৩-২১৫
অষ্টম অধ্যায়	বঙ্গে লৌকিক ইসলামের উদ্ভব ২১৬-২৫৬

'বঙ্গে সূফী প্রভাব' লেখকের গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত হয়েছে। উৎসর্গপত্রে আচার্যের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখক বলেছেন, তাঁর চরণ তলে বসে জ্ঞান সাধনার যে সুযোগ পেয়েছিলেন 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' তারই ফল। বর্তমানে পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য—বাংলা একাডেমীতে (কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ইতিহাস নং ৭৮) একটি জেরক্স কপি আছে।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক বলেছেন : 'বঙ্গে সূফী ভাবধারার মূল গতি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই বর্তমান পুস্তক রচিত হইল'[২৬]। বাংলায় সুফি ভাবের প্রবশ ও বিকাশের যে ব্যাপক ইতিহাস তিনি **'A History of Sufi-ism in Bengal'** গ্রন্থে প্রণয়ন করেছেন সে তুলনায় 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' খুবই সংক্ষিপ্ত কাজ। বাংলায় সুফিবাদের ইতিহাস রচনা একটি দুরূহ কর্ম—কেন দুরূহ সে জবাব লেখক নিজেই দিয়েছেন।

> পশ্চিম ভারত ও মুসলমান অধিকৃত অপরাপর রাজ্যে সূফীদিগের নানা জীবনী ও জীবন কথা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যঃ এযাবৎ বাঙ্গলায় তাহা হয় নাই; হইলেও অধুনা তাহা লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় সূফীদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[২৭]

বঙ্গীয় মুসলমানের 'সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ' পরিচয় এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইসলাম বাংলাদেশের আবহাওয়ায় যে রূপ-রং লাভ করেছিল তা অনেকক্ষেত্রে আরবীয় তওহিদবাদী ইসলামের বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর। এবং এই বঙ্গীয় বা ভারতীয় রূপ বহুক্ষেত্রেই ছিল অনৈসলামিক। এ বিষয়ে সচেতনভাবে, উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে লেখক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। নিবেদনে তিনি বলেছেন :

'এই পুস্তকে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার কোন কোনটি বাঙ্গালী মুসলমানের অনেক চিরন্তন বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে। কাহারও অন্তরে কষ্ট দেওয়া বা কোন বিশিষ্ট মত প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্যও নহে, ইচ্ছাও নাই।

মুসলিম সংস্কৃতির সর্ববাদীসম্মত মাপকাঠি শাস্ত্রীয় ইসলাম অর্থাৎ শরী'অৎ ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং এই পুস্তকে শরী'অতের মাপকাঠির সাহায্যেই সমস্ত বিষয়কে ওজন দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে যদি কোন মুসলমান মনে আঘাত পাইয়া থাকেন তাহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে।

বঙ্গীয় সুফিদের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'বাবা আদমই' সবচেয়ে প্রাচীন। তিনি বিক্রমপুরের বল্লাল সেন (মৃ. ১১১৯)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তার পর ময়মনসিংহের শহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমীর বঙ্গে আগমন ঘটে ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে।[২৮] অবশ্যি বঙ্গে সুফি আগমন সম্পর্কে পরে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন—পাহাড়পুরে হারুনর রশীদের মুদ্রা পাওয়া যাওয়ায় তিনি মনে করেন নবম শতাব্দীতে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।[২৯]

সুফি মতবাদের জন্ম সম্পর্কে ডক্টর হক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা ব্যক্তি বিশেষের মনঃপুত না হলেও, তত্ত্বগত বিশ্লেষণ হিসেবে তা যেমন মূল্যবান তেমনি ইতিহাস-অনুরাগী বুদ্ধিবাদীর নিকট গভীর আবেদনশীল। তাঁর মতে 'সূফীমতবাদ মানবের স্বাভাবিক চিন্তাধারা ও মর্মমুখ জ্ঞানের একটি স্ফূরণ। মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মর্মমুখ চৈতন্যের বিকাশও স্বাভাবিক'।[৩০] রসুল ও চার খলিফার পর :

একদিকে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা যেমন বাড়িয়া চলিল, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতা, অমিতাচার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐহিকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—মর্মের দিক নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত মরণের পথে ছুটিয়া চলিল।

কর্মের পথে যখন বিশেষরূপ বাড়াবাড়ি চলিল, মর্মের পথেও একটু বাড়াবাড়ি চলিতে লাগিল,—একটি নূতন প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইসলামে এই প্রতিক্রিয়া ও সংঘর্ষের ফলে সূফী ও তাহার অভিনব মতবাদের উদ্ভব হইল। (পৃ. ১৮)

ডক্টর হক মনে করেন 'সূফীদের আগমনে ভারতীয় সাধনা-গঙ্গার কূলে কূলে বান ডেকেছিল'। তাঁদের অনাবিল সাধনা, অমানুষিক তপস্যা ও দেবোপম আত্মোৎসর্গের দ্বারাই ভারতে ইসলাম অভিনন্দিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ''মুসলমান সাধকদের আগমনের ফলে ভারতের প্রাচীন সেবাধর্ম, ভারতের প্রাণের সংসার নিস্পৃহতা ও বৈরাগ্য এবং ভারতের অস্তোন্মুখ প্রাচীন সাধনা যেরূপ নূতন প্রাণ, নবীন বল ও অভিনব শক্তি লাভ করিয়াছিল তাহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হইবে।'' (পৃ. ৭১)। ভারতীয় সুফিতত্ত্বের বহু উপাদান ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ থেকে গৃহীত হয়েছে বলে ডক্টর হক মনে করেন। এ ধারণার সমর্থনে তিনি বলেছেন, ''ভারতের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (উপনিষদ)= পারস্যের 'হমহ্উস্ত' অর্থাৎ সকল বস্তুই ভগবান। এ চেতনার পরিভাষা হলো 'বিশ্ব-ব্রহ্মবাদ'। বিস্তামের মর্মবাদী দার্শনিক বায়জীদের 'ফণা' (=অহংলোপ)-এর সঙ্গে বৌদ্ধ 'নির্বাণ' তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে। নকশবন্দিয়া তরিকার সাধন পদ্ধতির 'লত্বিফহ্' ভারতীয় যোগশাস্ত্রের 'কুণ্ডলিনী' সদৃশ। 'মুরাকিবাহ'=যোগশাস্ত্রের আসন, ধ্যান বা সমাধি।

'ধিক্‌র'=জপ ; প্রাণায়াম—বস্তুত 'ভারতীয় সূফীরা জিকরকে তপ-জপ-প্রাণায়ামের পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করাইলেন।'' ডক্টর হক জোরের সঙ্গেই বলেছেন : ভারতীয় চিন্তায় পুষ্ট না হলে একাদশ শতাব্দী-পূর্ব সুফিমত বর্তমানে যে ভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা সম্ভব হত না। ভারতীয় অধ্যাত্ম শক্তির নানা প্রভাব সুফিতত্ত্বের মূলে রসসিঞ্চন করলেও বঙ্গের তান্ত্রিকশক্তির বীভৎস ক্রিয়া-কাণ্ডকে সুফি দরবেশরা নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক প্রতিপন্ন করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থের 'পঞ্চম অধ্যায়ে'র বিষয়বস্তু 'বঙ্গের কতিপয় ঐতিহাসিক সূফী' মূলত **'A History of Sufi-ism in Bengal'** গ্রন্থের ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ। এই অধ্যায়ের 'বঙ্গে সূফী প্রভাবের ফল' উক্ত গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় **The Sufi Influence on Bengal** এর অনুরূপ। বঙ্গে সুফি প্রভাবের অষ্টম অধ্যায় লৌকিক ইসলাম এবং **'A History of Sufi-ism in Bengal'**-এর দ্বাদশ অধ্যায় **'Growth of Popular Islam in Bengal'** সাদৃশ্যবাচক।

সে যাহোক, সম্প্রতি লিখিত 'পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক (ডক্টর গোলাম সাকলায়েন), পাকিস্তানের সূফী সাধক (আ. ন. ম. বজলুর রশিদ) এবং নানা লেখকের শাহ্‌জালাল, মইনউদ্দীন চিশতী ইত্যাদি জীবনী গ্রন্থসমূহের মূল প্রেরণা 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থ। পরবর্তী লেখকগণ একই বিষয়ে যখনই কোন মৌলিক (?) কথা বলবার প্রয়াস পেয়েছেন তখনই তাঁরা নানা প্রমাদ ঘটিয়েছেন! ডক্টর হকের এই আকর গ্রন্থ আলোচ্য বিষয়ে বহু পরগাছা জন্মের সহায়তা করেছে তা যেমন সত্য তেমনি বহু মৌলিক গবেষণায় আলোকবর্তিকাও হয়ে আছে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে প্রাজ্ঞ ডক্টর হক আরবি-ফারসি শব্দের বাংলা উচ্চারণ বা প্রত্যক্ষরীকরণে যে রীতি গ্রহণ করেছেন তা ভাষাতাত্ত্বিকের নিকট চিত্তাকর্ষক হলেও পাঠক-সাধারণের কাছে জটিল বলে মনে হবে। কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য করা যাক :

'ঔবায়্‌দু'-ল হক্‌ক ; ঘয়া থু'দ্‌-দীন ; সুলত্বান, হুদ্‌রত্‌ মুহম্মদ ইত্যাদি। বাংলা অভিধান বা বাঙালি লেখকগণ এ ধরনের উচ্চারণ কখনোই লিখেন না। সহজভাবে উবায়দুল হক, গিয়াস উদ্দীন, সুলতান, হজরত মুহম্মদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ডক্টর হকের জটিল প্রত্যক্ষরী-করণ পদ্ধতি আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাত্ত্বিক ও দার্শনিক হলেও ডক্টর হকের প্রকাশভঙ্গী অসাধারণ মনোহারিণী। অধ্যাত্ম-পরিভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও মাধুর্যে, সঙ্গীতে এর ভাষা আকর্ষণীয়।

মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতি ডক্টর হকের অনুরাগ প্রবল এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রতি সে অনুরাগ প্রবলতর। সুফিবাদের ইতিহাস রচনার মধ্যে যে অনুরাগের সূচনা, 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' তারই প্রবাহিত রূপ। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> নিজেদের ইতিহাস, বিশেষ করিয়া সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জানিবার যে কোন স্বাধীন জাতির পক্ষে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার আবশ্যকতা ও ঐরূপ জাতির পক্ষে নিতান্ত কম নহে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মুকুরে নিজেদের মুখ দেখিয়াই জাতি আপন আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইয়া উঠে। ৩১

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে পাকিস্তান-চেতনা এবং ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির অভিন্ন স্বভাব লেখক-মানসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। প্রসঙ্গত পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) মুসলমানদের জাতিগত বিশিষ্টতার পরিচয়ও তিনি তুলে ধরেছেন। ১৩৪৪ সালে মাসিক মোহাম্মদীতে গ্রন্থখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গে ইসলাম বিস্তার' শিরোনামায়। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে 'পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম' নামে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। তবে প্রথম অধ্যায়টি (পাকিস্তানের স্বপ্ন, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম বিস্তৃতির কাল নির্ণয়) নতুন করে লেখা। দ্বিতীয়ত মাসিক মোহাম্মদীতে যা 'বঙ্গীয়' ছিল তাকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানী' রূপ দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থখানি আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় 'উপক্রমণিকা'—এখানে 'পাকিস্তানের স্বপ্ন' এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম বিস্তৃতির কাল নির্ণয়' নামক দুটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করে লেখক গ্রন্থের পাকিস্তানী রূপদানের প্রয়াস পেয়েছেন। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলোতে বাংলায় ইসলামের আগমন (৮০০ খ্রী. ?) থেকে পাকিস্তান আমলে ইসলামের বিস্তার ও বিকাশের এবং নানা অবস্থার ঐতিহাসিক আলোচনা একটি বিশিষ্ট মতাদর্শের পরিচয় দ্যোতক। দ্বিতীয় অধ্যায় / পরিচিতির যুগ (৮০০-১২০০), তৃতীয় অধ্যায় / যোধনীয় প্রবর্তনার যুগ (১১৭৫-১৩৫০), চতুর্থ অধ্যায় / শান্ত প্রবর্তনার যুগ (১৩২৫—১৫০০), পঞ্চম অধ্যায় / বৈষ্ণব প্রতিক্রিয়ার যুগ (১৪৮৫-১৬৫০), ষষ্ঠ অধ্যায় / স্থায়িত্ব প্রাপ্তির যুগ (১৬২৫-১৮২৫), সপ্তম অধ্যায়/ সংস্কার যুগ (১৮০০-১৯৪৭), অষ্টম অধ্যায়/পাকিস্তান যুগ (১৫ই আগস্ট ১৯৪৭)। ইসলাম বিস্তারের এ-বিবরণ নিঃসন্দেহে একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস।

উপক্রমণিকায় মি. জিন্নাহ্‌র ছবি মুদ্রণ, গ্রন্থশেষে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান মুদ্রণ একটি তরল সেণ্টিমেণ্টের পরিচায়ক। পাকিস্তানের স্বপ্ন বার শত বৎসর পূর্বে আরব বণিকদের প্রচার এবং তাদের সঙ্গে এ স্বপ্নের যোগসূত্র। এ অনুসন্ধান যুক্তিবাদী ঐতিহাসিকের কাজ নয়—শ্লোগান সর্বস্ব পাকিস্তানপন্থীদের কাজ। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় অথবা তিরৌরী ও খানুয়ার সংগ্রাম ও পাকিস্তান আন্দোলন সমান্তরাল ব্যাপার বলে গ্রহণ করা যায় কিনা তাতে সন্দেহ আছে। তিরৌরী ও খানুয়ার সংগ্রাম একান্তই সামরিক ঘটনা, তাৎক্ষণিক বিজয়ের ব্যাপার ; কিন্তু পাকিস্তান সংগ্রাম একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া—একটি আন্দোলন। এর তাৎপর্য ভিন্নতর বলেই মনে হয়। তবে ডক্টর হক যে দৃষ্টিতে সমগ্র বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছেন তা একটি বিশেষ সময়ের চেতনায় ভাস্বর—পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অনুসন্ধানকারীরা সেকালে এধরনের কাজই করেছিলেন ; যার মধ্যে রয়েছে অনেক কাকতালীয় ব্যাপার। ডক্টর হক পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম বিস্তারের ইতিহাস শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়কে পাকিস্তানের স্বপ্ন (!) এবং (অষ্টম অধ্যায়ে) মুসলিম লীগ, জমিয়ৎ-ই উলেমা—ইসলাম ও তবলিঘের ধারায় সংযোজিত করে মূল বিষয়কে বিড়ম্বিত করেছেন বলে মনে হয়।

গ্রন্থখানির দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপন সুশৃঙ্খল ও ঐতিহাসিক চেতনা-সমৃদ্ধ। সপ্তম অধ্যায় সংস্কার যুগ (১৮০০-১৯৪৭) বলে কথিত। স্বীকার্য যে, ফারাইজী, মুহম্মদী, আহল-ই-হাদীস, আহমদী বা কাদিয়ানী (এবং হাট হাজারিয়া) আন্দোলনের মধ্যে ফারাইজী আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন। অন্যান্য আন্দোলন বিশেষ-বিশেষ মত-প্রধান ইসলামী আন্দোলন। এসব মতাদর্শের প্রভাবও কম নয়। কিন্তু হাটহাজারিয়া কোন্ মতাদর্শ-ভিত্তিক আন্দোলন তার আবেদন ও প্রভাব কি তা সাধারণের অজ্ঞাত। তাছাড়া ১৮০০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ পর্যন্ত সংস্কার চলছে এমতও গ্রাহ্য নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য: "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে

এ দেশের ইসলামী ইতিহাসে নূতন চিন্তা ও নবীন কর্মপ্রেরণা দেখা দিয়াছিল। তাহাই গতিবেগ সঞ্চার করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে।'' (পৃ. ৮-৯)। ডক্টর হকের এ-মন্তব্য তথ্য বা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—আবেগই এমন মন্তব্যের পটভূমি।

ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল ধর্মাবলম্বীর সংখ্যার ভিত্তিতে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হলো আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি এই বিভক্তির মূলে সক্রিয়। লেখকের মতে ''সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যা লঘিষ্ঠতা ভারত বিভাগের নীতি নহে, —ভিত্তিমাত্র। আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিকে—অর্থাৎ আমার ধর্ম, আমার ভাষা, আমার শিক্ষা, আমার আচার-ব্যবহার স্বল্পকথায় আমার সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নতি বিধান স্বাধীনভাবে করিবার অধিকার আমার আছে, এই নীতিতেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে। (পৃ. ৩)।'' লেখক-কথিত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারবোধ স্বাভাবিক (Natural), এর বিরোধী প্রয়াস বিপ্লবের জন্ম দেয়। যে নীতি ডক্টর হক ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলে ধরেছিলেন সেই একই নীতি প্রযোজ্য হয়েছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টিতেও। সুতরাং তাঁর পুর্বোক্ত বক্তব্যের মধ্যে এ রাষ্ট্র জন্মের সম্ভাবনার কথা স্বীকৃত ছিল।

বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে ডক্টর হক খান বাহাদুর ফজল-ই-রব্বি-র 'হকিকৎ-ই-মুসলমান-ই বাঙ্গালা' গ্রন্থ এবং ডক্টর ওয়াইজের 'Origin of the Mussalmans of East Bengal' প্রবন্ধের মতকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফজল-ই-রাব্বির আভিজাত্যবোধ এবং ওয়াইজের বানোয়াট সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি নৃতাত্ত্বিক স্বভাবের প্রতিই শ্রদ্ধাপোষণ করেছেন। চট্টগ্রামের মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, চট্টগ্রামের অনেক মুসলমান প্রাচীন আরবদের বংশধর বলে দাবি করেন—এ দাবির পশ্চাতে সত্য নিহিত আছে। তাছাড়া বঙ্গ বিজেতা তুর্কি সৈন্যগণ এ দেশ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন এমন প্রমাণও নেই। এ-সব কারণে ''এই যুগে বঙ্গে বহু বিদেশীয় মুসলমানদের আমদানী হইয়াছিল।'' এই 'বহু বিদেশী মুসলমান' ছাড়া অবশিষ্টরা নিশ্চয়ই দেশী ধর্মান্তরিত মুসলমান।

'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' গ্রন্থখানি বাংলাদেশে ইসলাম বিস্তার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবেও এর মূল্য আছে। একজন সাহিত্যিকের দ্বারা এমন ঐতিহাসিক গবেষণা বিরল—সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজে বইটি আকর গ্রন্থরূপে বিবেচিত হবে।

'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' প্রকাশের প্রায় দশ বছর পর ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের একটি ধারাবাহিক ও সুশৃংখল ইতিহাস। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খণ্ড প্রবন্ধ ও বিক্ষিপ্ত আলোচনা এবং গবেষণার প্রয়াসও যে লক্ষিত হয়নি তা নয়। দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) থেকে আরম্ভ করে ডক্টর সুকুমার সেনের 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' (১৯৫১) পর্যন্ত এ জাতীয় প্রয়াসগুলো অবশ্যি স্মরণযোগ্য। কিন্তু এই সব রচনায় মুসলিম অবদানের যে পরিচয় আছে তা সুসংহত ইতিহাস নয়, তথ্য-সংকলন—ডক্টর হকের গ্রন্থ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

সাহিত্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ফসল, সুতরাং তার ইতিহাস সেই জীবনের একান্ত সন্নিহিত বিবরণ। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ঐতিহাসিকের অবশ্যই বিবেচ্য। ডক্টর হক, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের ইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে, নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের ঔৎসুক্যে দেশকালের গতিধারার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিয়েছেন।

গ্রন্থখানি ৬টি অধ্যায়ে এবং ১৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান পাবলিকেশান্স্ থেকে। সময়ের দিক থেকে, এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ, পাকিস্তানী বাঙালিদের নিকট সবিশেষ প্রেরণারূপে কাজ করেছিল। পাকিস্তান আমলে মুসলিম-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা একটি প্রিয়-প্রসঙ্গ হয়ে উঠে; ডক্টর হক এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক গোলাম সাক্লায়েন, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ যে গবেষণা করেছেন তার পটভূমি নির্মাণে ডক্টর হকের অবদান অনস্বীকার্য।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' সম্পর্কে প্রথম স্মরণীয় কথা হলো—গ্রন্থের নামে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন থাকলেও জীবনবোধ এবং রচনা প্রক্রিয়ায় একটি সুস্থ, নিরপেক্ষ, সৌন্দর্য-পিয়াসী শিল্পীমন ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা চেতনা বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন—কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার কর্দমাক্ত পরিবেশ মূর্ত করেছেন; কেউ কেউ জাতিগত আভিজাত্য ও বঞ্চনার রোষে ইতিহাসের এক পঙ্কিল অধ্যায়কে ঘুলিয়ে তুলেছেন তাতে জাতীয় মানসের স্বাস্থ্যহানী ঘটেছে। ডক্টর হক এই বিভ্রান্তি, রোষ, পঙ্কিলতা ও অসুস্থ মানসিকতা এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে সমন্বয়, সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তা, মুসলিম কীর্তির মধ্যে মানবিক সত্যের উপলব্ধি ডক্টর হকের গবেষণায় রূপলাভ করেছে। একারণে, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' প্রকাশের পর একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যকে পাকিস্তানের 'তাহজীব-তমদ্দুন' পরিপন্থী বলে নোংরা কটুক্তিভরা সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে 'আজাদ' পত্রিকায়।[৩২]

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ডক্টর হক খাঁটি ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করেছেন। ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্বের ঘনিষ্ঠতাও এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা অনুসরণ করেছেন। একমাত্র ধর্মকে তিনি ইতিহাসের প্রবাহের নিয়ামক-শক্তি বলে মনে করেন না। তাই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, বাঙালি ও মুসলমান বিষয়-গুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সোসিও-এ্যানথ্রোপলজিক্যাল আবহে, ইতিহাসের প্রবহমান ধারার সঙ্গে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয় এ সাহিত্য আকস্মিকতার ফসল নয়—ইতিহাস প্রক্রিয়ার সম্পূরক।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে (প্রথম পরিচ্ছেদ) সংক্ষেপে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, বাংলাদেশ ও বাঙালি (বাংলাদেশ ও মুসলমান ?) সম্পর্কে একটি পটভূমি সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত ঋক্‌বেদের শাখা 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে যে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায় তারই একাংশ বর্তমান বাংলাদেশে। মুসলিম-পূর্ব যুগে বঙ্গভূমি বহু জনপদে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিন্ন জনপদ-সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবার কাজ সাধিত হয় মুসলিম যুগে :

> বঙ্গে তুর্কী শাসনকালে ইহার সূত্রপাত হয় এবং মুঘল-আমলে আকবরের শাসন-কালে ইহার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। সম্রাট আকবরের সময়েই সমগ্র বঙ্গদেশ 'সুবহ্-ই-বঙ্গালহ্' নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ আমলে আসিয়া ইহার বিশাল আয়তন (বিহার ও উড়িষ্যাসহ) কতকটা খর্বীকৃত হইয়া বাংলাদেশ সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। অতএব, যে বাংলাদেশ বলিতে আমরা নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করি, তাহার স্রষ্টার কৃতিত্ব মুসলমানদেরই প্রাপ্য।[৩৩]

'বাংলা' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা দুটি মতের সমন্বয় জ্ঞাপক—সংস্কৃত 'বঙ্গ' শব্দ যা 'বং' গোষ্ঠী জ্ঞাপক এবং আইন-ই-আকবরীর লেখক আবুল ফজল 'বং' শব্দের তদ্ভব 'আল' শব্দ যোগে 'বংগাল' শব্দ সৃষ্টি করেছেন। তার 'মুলুক্-ই-বনগালহ' এখন বাংলা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলিম অধিকার পর্যন্ত ছিল এক বিশাল ভূভাগ—আরাকানের পশ্চিম ভাগ থেকে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্রবিধৌত সমগ্র অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানেই বাংলাভাষা ও বাঙালি জনসমষ্টির মূল কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ডক্টর হক বলেছেন: "নৃতাত্ত্বিক বিচারে একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, এই বিশাল ভূ-খণ্ডের জনসমষ্টি প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রধানত আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) ও আলপাইনীয় (Alpinus) এই দুই প্রধান জনসমষ্টির সংমিশ্রণ (পৃ. ৩)।" এর সঙ্গে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের রক্তেরও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর মতে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে বাঙালির রক্তে সেমীয় গোত্রের লোকের রক্ত মিশতে থাকে, অতঃপর সেমেটিক গোষ্ঠীর লোককে অনুসরণ করে এদেশে আসতে থাকে আফ্রিকান নিগ্রোটো হাবশীরা। এরাও বাঙালির রক্তের সঙ্গে নিগ্রোটো রক্ত মিশিয়ে দিয়েছে। জাতি ও ভাষার কথা স্মরণ রেখে লেখক বলেছেন:

> আধুনিক বাঙালী অনার্য, আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমীয়, নিগ্রো প্রভৃতি নানা গোত্রভুক্ত মানবের রক্ত মিশ্রণ জাত এক বিচিত্র জন-সমষ্টি (People)। এই বিচিত্র রক্ত সঙ্কর জন-সমষ্টির ভাষার আধুনিক নাম 'বাংলা'। (পৃ. ৪)

এ ধরনের বক্তব্য সমকালীন পাকিস্তানী তমদ্দুনের গোঁড়া সমর্থকদের ক্ষুব্ধ করেছিল। ১৯৫৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারির 'আজাদ' ডক্টর হকের বিরুদ্ধে কি নির্মম আক্রমণ চালিয়েছিল তার নমুনা পেশ করছি:

> এনামুল হক যেদিন 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে, গুরুবাক্য, পাকিস্তানী ছাপায় প্রকাশ করিলেন, সেদিন আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। তবু কাহারো কাহারো গা রি রি করিয়া উঠিল। তাহারা প্রতিবাদ করিলেন—প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ ছাপা হইল। সাহিত্য ও ভাষা ছাড়িয়া সেই প্রাঙ্গণে রাজনৈতিক দলীয় লড়াই চলিতে শুরু হইল। ফল দাঁড়াইল এই: পাকিস্তানী দল বিভাগের সুযোগ লইয়া—কলিকাতা ও দিল্লীর সাংস্কৃতিক ঝাণ্ডা বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়াশীর্ষেও কায়েম রহিল। যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের জন্য কচি বুকের তাজা খুন একদিন ঢাকার রাজপথে ধূলায় মিশিয়া গিয়াছিল, সেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিখরদেশে কলিকাতার সাংস্কৃতিক পতাকা সগর্বে উড়িতে থাকিবে, ইহাই কি দেশের লোক চাহিয়াছিল? বিভিন্ন দল কি অন্ততঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারেন না—দল ছাড়িয়া তাঁহারা কি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন না—রাজকোষের অর্থ ব্যয় হইল যে রচনার জন্য তাহাই সত্য ইতিহাস কি না।[১৪]

—এ সমালোচক চণ্ড-রাজনীতির শিকার, তাঁর বিষয় সাহিত্য প্রসঙ্গ হলেও বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থান্ধতায় আচ্ছন্ন।

মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রণেতাদের সামনে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ একটি 'প্রদীপ শিখা' মাত্র: আমাদের সংস্কৃতির এ অধ্যায়কে আলোকময় করে তুলতে সময় ও

সাধনার প্রয়োজন একথা তিনি ভূমিকায় পরিষ্কারভাবেই বলেছেন। তবু এ নতুন পথে পরিক্রমণের যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা তিনি দিয়েছেন তা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস চেতনার ফল, কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান বা মুসমিল বাংলা সাহিত্য কোন ভুঁইফোড় ব্যাপার নয়, আকস্মিক ঘটনাও নয়--বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারায় তার জন্ম। লেখক দেশ-কাল-মানুষ- ভাষা, সমাজ-পরিবেশ আলোচনায় প্রথম অধ্যায়ে সে কথা পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেছেন। তিনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন—বাংলাদেশ ও বাঙালি, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর তুর্কি বিজয় ও তুর্কি আমলে সৃজ্যমান ইসলামি পরিবেশ সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন তাকে তুর্কি আমলের বাংলা সাহিত্যের পটভূমি বলা যায়। ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন মুসলিম রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর একটি যুগসন্ধি চলেছে—এ সময়ে "ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার বাঙালীর মনোরাজ্যে নবজাগরণ আনিয়া দিল, ইহাতে তাঁহাদের মানস-জগৎ নবজীবনের সংস্পর্শে বিপ্লবীমুখী হইয়া উঠিল।" একদিকে ইসলামি সংস্কৃতির টান অন্যদিকে পূর্বপুরুষদের ধর্ম সংস্কৃতির বন্ধন—এ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এক সংস্কৃতি বিলীন অন্য সংস্কৃতি সৃজ্যমান হয়ে উঠল। এ-সন্ধিকালে সাহিত্যকর্মের পরিমাণ কম কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে আন্তর-জিজ্ঞাসা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

অতঃপর, গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে, লেখক বলেছেন, স্বাধীন মুসলিম বাংলায়, ১৩৫০ থেকে "বাংলা-সাহিত্য ও চারুকলার পরিপোষক আবহাওয়া সৃষ্টিতে একটির পর একটি করিয়া মুসলিম সুলতানদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব প্রবল অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে।" এই ঐতিহাসিক সত্য ঘোষণার পর লেখক মধ্যযুগের বাংলার কবি ও কাব্য পরিচয় তুলে ধরেছেন সাধকের নিষ্ঠায়, আবিষ্কারকের অশ্রান্ত শ্রমে। স্বাধীন বাংলার (১৩৫০-১৭৫৭) শাহ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, মুজাম্মিল, চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী, সাবিরিদ খান, দোনাগাজী, শেখ ফয়জুল্লাহ্, দৌলত উজীর বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর প্রমুখ কবি এবং মুঘল আমলের সয়্যিদ সুলতান, শৈখ পরান, হাজী মুহম্মদ, নসরুল্লাহ্ খাঁ, মুহম্মদ খান, সয়্যিদ মুর্তুজা, আবদুল হাকীম, নওয়াজিস খাঁ, গরীবুল্লাহ্, হায়াত মাহমুদ; রোসাঙ্গের কবি দৌলত কাজী, আলাউল, মাগন ঠাকুর; ত্রিপুরা রাজ্যের কবি শৈখ চাঁদ, শুকুর মুহম্মদ, রফীউদ্দীন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য উপকরণ তিনি উপস্থিত করেন। মধ্যযুগের চার শতাধিক বছরের মুসমিল বাংলা সাহিত্যের এমন ধারা-বাহিক তথ্যভূয়িষ্ঠ ইতিহাস এ-ই প্রথম। জীবন ও কাব্য আলোচনা ছাড়াও আলোচনার অভিনব পরিকল্পনা--সাহিত্য-সমাজ-জীবন, সংস্কৃতি সাধনা, ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-ভৌগোলিক রূপের পরিচয় উন্মোচন করেছে। কাব্যের শ্রেণী-ভিত্তিক সাধারণ আলোচনায় স্বাধীনতাযুগের কাব্যকে কাহিনীকাব্য, ধর্মীয়কাব্য, সংস্কৃতি-সমন্বয়-সঞ্জাতকাব্য, লোকগাথা, জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় কাব্য, সংগীত-শাস্ত্রীয় কাব্য ইত্যাদি ভাগে এবং মুঘল আমলের কাব্যকে ইসলামী শরা-শরীয়ৎ মুসলিম কাহিনী, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন বা সূফীতত্ত্ব, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাব্য, রূপক কাব্য, পদাবলী সাহিত্য ইত্যাদি ভাগে তিনি বিন্যাস করেছেন; ফলে পণ্ডিত, অনুসন্ধান-বিদ ও গবেষকদের নিকট মধ্যযুগীয় সাহিত্যের নব-নব-দিগন্ত খুলে গেছে। তাঁর উদঘাটিত ও নির্দেশিত পথে গবেষণা করে বেশ কিছু সংখ্যক লুব্ধ-গবেষক মূল্যবান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। সুতরাং মুসলিম বাংলা সাহিত্য চর্চায় ডক্টর হকের অবদান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু-ই। প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি যে সাধনা করেছিলেন তার ফসল ফলছে ক্রমাগত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করে অধুনা যে-সব পণ্ডিত ডিগ্রি এবং খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' নামক গ্রন্থখানির নিকট ঋণী।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে'র পঞ্চম অধ্যায় 'ইংরেজ আমলে মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৭৫৭-১৯৪৭)। সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তিনি অগ্র-পথিক, এমনকি স্তম্ভ-স্বরূপও বলা যায়। বর্তমান গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্বে সংযোজিত হয়েছে দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশ নির্ভর এক বা একাধিক পটভূমি-প্রবন্ধ। ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস অনুসন্ধানে এবং একালের সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নির্ণয়ে ডক্টর হকের গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করতে গিয়ে তিনি ইংরেজ-অধিকার এবং মুসলমান সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূলধারার গতিপথে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের যাত্রা অনুধাবন করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিমুখ থাকার কারণেই মুসলমান সমকালীন হিন্দুর চেয়ে কমপক্ষে অর্ধ-শতাব্দী পিছিয়ে পড়েছে। যেমন বিদ্যা ও বিত্তের ক্ষেত্রে তেমন মনন চর্চার ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দু যখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিৎ পাকা করে তুলেছে দুর্গেশনন্দিনী, মেঘনাদবধ কাব্য, নীল-দর্পণ যখন প্রকাশিত হয়েছে তখনও মুসলিম বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় ধারার অনুবর্তন (১৭৫৭-১৮৬৬) চলছে—হিন্দু সাহিত্যিকদের "অক্লান্ত চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় গদ্যরীতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পাশ্চাত্য-প্রভাব-দীপ্ত কাব্য ধারা যখন পূর্ণ-বিবর্তিত, সবে তখনই বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের এই যে অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালের বিলম্বিত প্রবেশ, ইহাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য প্রধানত দায়ী।" (পৃ. ৩০১)

ডক্টর হক মনে করেন যথা সময়ে মুসলমানেরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাদের অবদান হিন্দুদের চেয়ে ন্যূন হতো না। এটি অবশ্য আপেক্ষিক ধারণা। আধুনিক সাহিত্য প্রধানত হিন্দু-ঐতিহ্যবাহী কিন্তু এই হিন্দুঐতিহ্য দ্বারা বাঙালি মুসলমানেরা প্রভাবিত হয়নি বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। উত্তর সাতচল্লিশের মুসলিম সাহিত্যিকদের রচনা ও জীবনবোধের যে পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন তা সংক্ষিপ্ত।

গ্রন্থখানি প্রকাশের পর মুসলিম রেনেসাঁর কট্টর অনুসারীরা তাঁকে নির্মম ও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। এঁদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা,[৩৫] সৈয়দ আবদুল মান্নান,[৩৬] মঈনুদ্দীন মুজাহিদ[৩৭] এবং স্বয়ং আকরম খাঁ[৩৮] পুরোভাগে ছিলেন। এছাড়া বেনামে, আভাসে-ইঙ্গিতেও কেউ কেউ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচকরা সবাই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থখানির সমালোচনা করেছেন সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এ-ই সব সমালোচনায় নেই বললেও চলে। জাতির 'তামুদ্দুনিক বুনিয়াদ' ও 'সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে' তাঁদের মতে এ গ্রন্থ 'একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল।' মওলানা আকরম খাঁ এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক 'হীন ষড়যন্ত্র'। তাঁর ভাষায় "কলিকাতা হইতে কাগমারী পর্যন্ত যে হীন ষড়যন্ত্র এক যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আমার মতে, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই একটা সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মাত্র।"[৩৯] পূর্বোক্ত মঈনউদ্দীন মুজাহিদের এ বক্তব্যের শুধু সুর নয় কথাও এক। কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন: "তথ্যের ভুল, লক্ষ্য ও আদর্শের বিকৃতি, অন্তর্দৃষ্টির অভাব এবং পরিবেশনার অক্ষমতা পুস্তকখানিকে ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত করিয়াছে।"[৪০] কবি গোলাম মোস্তফা এবং তাঁর সহকর্মীরা গ্রন্থে কোনই ভাল দিক বা ভাল কথা পাননি এটাই আশ্চর্য লাগে। তাঁর অভিযোগগুলো কাল্পনিক এবং বিদ্বেষমূলক।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' এই নামটি সম্প্রদায়-ঘেঁষা হলেও গ্রন্থের প্রাণ ও পরিসজ্জা মুক্তবুদ্ধি ও মননশীলতায় উজ্জ্বল। যে 'ষড়যন্ত্রের' কাল্পনিক ভূত একশ্রেণীর 'তমদ্দুন'

পন্থী এ গ্রন্থ দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন তাদের ধারণা যে বিভ্রান্ত তা কাল নির্ধারণ করে দিয়েছে। ১৯৫৭ বা ১৯৬৫ সালে ডক্টর হক যে ঐতিহাসক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে-ছিলেন তা সেকালে বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক সমালোচিত হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় তাকে সমর্থন করেছে। তাই 'তথ্য বিকৃতি' ও 'ভুলের' অভিযোগ ধোপে টেকে না ; আর 'পরিবেশন অক্ষমতা' যাঁরা বলেন তাঁরা নিশ্চয়ই মাত্রাজ্ঞান বিবর্জিত।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের যে পরিচয় এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তা ব্যাপক কিন্তু আধুনিক যুগ-পরিচয় আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণেও এদিকে লেখক মনোযোগ দেননি। অথচ একালের অনেক সাহিত্যিক সম্পর্কেই পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে। পাকিস্তান যুগ আরও সংক্ষিপ্ত হয়েছে—এ যুগ পরিচয়কে সংক্ষিপ্ত করণের পক্ষে লেখকের দিক থেকে হয়তো যুক্তি আছে কিন্তু গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে এযুগের প্রতিভাবান এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সম্পর্কে বিস্তৃততর পরিচয় আশা করবারও বহু যুক্তি আছে। সমকালীন সৃষ্টিরও যে তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ অসুবিধাজনক নয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ-সাহিত্যে উপ-ন্যাসের ধারা' গ্রন্থের সাম্প্রতিক সংস্করণ।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা হলেও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তৎকালীন সরকার এর ইংরেজি এবং উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন করাচী থেকে। সৈয়দ আলী আশরাফ কৃত ইংরেজি অনুবাদ Muslim Bengali Literature বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্পর্কে বিদেশী, অবাঙালি পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। Muslim Bengnli Literature মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আক্ষরিক অনুবাদ। কোথাও কোথাও অনুবাদ সহজবোধ্য এবং সুন্দর হয়েছে। ভূমিকার প্রথম স্তবকটি এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। মূলে আছে :

> জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে-দিক এই পুস্তকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এতকাল একরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সময়ে সময়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে মশাল-বর্তিকার (Torch Light) সাহায্যে এই অন্ধকারে কেহ কেহ আলোকপাত করিবার চেষ্টা পাইলেও আমাদের এই সাংস্কৃতিক কক্ষে কখনও কোন স্থায়ী প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই ; বিজলী-বাতি বসাইবার কথা না বলাই ভালো।

অনুবাদ :

> The literary aspect of our National culture which I have tried to Project in this Volume, lay buried for a long time in obscurity. Through from time to time some stray scholars revealed a few glimpses of it to our eyes through their illuminating research, the grand edifice had yet come to full view.

অনুবাদে, গ্রন্থের পরিসরে কোন তারতম্য ঘটেনি। তবে একান্তভাবে আক্ষরিক করতে গিয়ে কৃচিৎ-ক্ষেত্রে দ্বৈত-অর্থ বা কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতাও দেখা যায়। যথা :

> বাংলা অতি প্রাচীনদেশ। ঋগ্বেদের (আনুমানিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর) শাখা 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ নামে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গ-

ভূমি 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সূহ্ম', 'ব্রহ্ম', 'তাম্রলিপ্ত', 'সমতট' প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। (পৃ. ১)।

অনুবাদ :

The Land Bengal traces its history back to about 3,000 B.C. In the Aitareya Aranyak, a part of the Rig Veda, this country has been referred to as Vanga. From that era upto the 7th century A.D., ancient Bengal was split up into several tribal tracts, such as Banga, Pundra, Gauda, Rarha, Summa, Brahma, Tamralipati and Samatata.

এখানে 'that era' বলতে লেখক ঋগ্বেদের কাল, না, ঐতরেয় আরণ্যকের কাল কোন্‌টা বুঝিয়েছেন পরিষ্কার বোঝা যায় না। উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদ এবং ঐতরেয় আরণ্যকের কালের ব্যবধান অন্যূন কয়েক শতাব্দী। ঐতরেয় আরণ্যকের প্রতি গুরুত্ব দিলে মনে রাখতে হবে তার রচয়িতার কাল। এ গ্রন্থের রচয়িতা মহিদাসের কাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়, তাহলে বাংলাদেশের প্রাচীনতা সুপ্রমাণিত হয় না। গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ অসার্থক তা বলা যায় না। তবে বাংলা বাক্যের প্রাণের স্বর-সত্তা কখনো কখনো ইংরেজিতে স্পষ্ট হয়নি। 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে'র বিরুদ্ধে দৈনিক আজাদ গোষ্ঠী ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী বলে যে প্রচারণা চালিয়েছে তা মিথ্যা এবং অযৌক্তিক। পশ্চিম বাংলার যে 'মামদো ভূতে'র ছায়া দেখে তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে আঁতকে ওঠেন তা আসলে তাঁদেরই কাল্পনিক সৃষ্টি। এ সম্পর্কে ডক্টর হকের বক্তব্য সবটা না পড়েই তাঁরা প্রচারণা শুরু করেছিলেন। ডক্টর হক ঐ গোষ্ঠীর চেয়ে কম ইসলাম ও দেশভক্ত ছিলেন না। মুসলিম বাংলা সাহিত্যের সিদ্ধান্ত-স্তবকে বলা হয়েছে :

As our Geography, National idiology and even Language are seperate and distinct from those of West Bengal, our Literature must be different in many respects and build up a new characteristic tradition in future.[৪১]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ছাত্রজীবন থেকেই নানা বিষয়ে খণ্ড প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯২৮ থেকে বিগত ৫০ বছরে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে তদ্বিরচিত বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ সব প্রবন্ধের তালিকা আমাদের সামনে নেই। ঐ সব পত্রিকাও সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। খ্যাত, অখ্যাত; নিয়মিত, অনিয়মিত; পত্রিকা এবং সংকলনে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক সময় প্রতিবেদন-আকারেও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুসন্ধানে যে সব ধরনের প্রবন্ধ আমাদের জ্ঞানসীমায় এসেছে তার সংখ্যা নিম্নরূপ :

১ মনীষা-মঞ্জুষা ১ম খণ্ড ১৯টি

২ ঐ ২য় খণ্ড ১৭টি

৩ অন্য লেখকের গ্রন্থের ভূমিকা অন্যূন ৩১টি

৪ সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা (বাংলা)
সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা (ইংরেজি) } ৭টি
দ্র. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।

৫ বাংলা একাডেমীর 'পরিনিয়ন্তা' হিসেবে 'একাডেমীরকথা' নামক প্রতিবেদন নিবন্ধ। একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত। অন্যূন ১০টি

৬. মনীষা-মঞ্জুষা-বহির্ভূত (দ্র. এই গ্রন্থের
দ্বিতীয় অধ্যায়) অন্যূন ৩০টি

১১৪

এই সংখ্যা তা কোন অর্থেই সম্পূর্ণ নয়। নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন।[৪২] গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে জীবনে কোন কোন পর্যায়ে দীর্ঘ বিরাম লক্ষ্য করা যায় কিন্তু প্রবন্ধ রচনার দ্বারা তিনি সেই শূন্যতা ভরাট করেছেন। ডক্টর হক গবেষক হিসেবে সাধক কিন্তু প্রাবন্ধিক হিসেবে স্বাভাবিক। গবেষণা, প্রবন্ধ রচনা, কোন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন অথবা ব্যক্তিগত পত্র রচনার মধ্যে ডক্টর হকের সৌন্দর্য-সিক্ত বৈশিষ্ট্য, পাঠকের অভিনিবেশ আকৃষ্ট করে। বাক্য রচনার সুঠাম বাঁধুনি, ধারণার স্পষ্টতা, শব্দ প্রয়োগের পরিমিতিবোধ এবং বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর রচনাকে অন্তর্বেদ্য ও উপভোগ্য করে তোলে—একটি শিল্পী-মন ও অনুরাগী স্বভাব তাঁর রচনায় সৃষ্টি করে বর্ণিল বিভাস।

মুহম্মদ এনামুল হকের প্রথম পর্যায়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'কবি সৈয়দ সুলতান' উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির গোড়াতেই লেখক দাবি করেন: "এই প্রাচীন মুসলমান কবি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন ঐতিহাসিক বা সমালোচনামূলক আলোচনা হয় নাই। তবে যে দিক্ হইতে বিচার করা যাউক না কেন, তিনি যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই"।[৪৩] তিনি সর্ব প্রথম এ-কবি সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন ১৯৩৩ সনে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনীতে। উত্তরকালে এ-বিষয়ে উপাধি-অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে।

'কবি শেখ চান্দ' সম্পর্কীয় আলোচনারও তিনিই পথিকৃৎ।[৪৪] পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ডক্টর হকের প্রবন্ধ রচনার কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুথির মধ্যে 'চারি মঞ্জিলের কথা' নামক বিরাট খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি ছিল। একে ডক্টর হক 'রসুল বিজয়' নামে অভিহিত করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঐ কাব্যের তিনখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। শেখ চান্দের 'রসুল বিজয়' কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর হক বলেছেন:

> হজরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় ফথে মোহাম্মদ পুত্র শেখ চান্দ যে কাব্য-রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বারা মুসলমানদের হজরত মোহাম্মদ আর হজরত মোহাম্মদ রহেন নাই,—শ্রীকৃষ্ণে পর্যবসিত হইয়াছেন। এদিক হইতে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে 'রসুল বিজয়' কাব্য খানি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের একটি প্রতিরূপ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, কবি তাঁহার কাব্যে স্বীকার করুন বা না-ই করুন, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কাব্যই কবির আদর্শ ছিল।

প্রশ্ন ওঠে 'রসুল বিজয়' শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যের আদর্শে রচিত হলো কেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর হকের ব্যাখ্যা প্রণিধান যোগ্য:

> মনে হয় এ দেশের নবদীক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ঐসলামিক সংস্কৃতি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এমনটি করা হইয়া থাকিবে। এ কথা নিতান্তই সত্য যে এ দেশের সাধারণ মুসলমানের মধ্যে পুরুষকারপূর্ণ হজরত মোহাম্মদের চরিত্র যতটা ক্রিয়া করিতে পারে না, তাঁহার প্রতি অযথা আরোপিত আলৌকিকত্ব ততোধিক ক্রিয়া করে। সুতরাং বাঙ্গলার মুসলমান এবং হিন্দুর সম্মুখে হজরত মোহাম্মদকে দেবতা-রূপে দাঁড় করান কবির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।········কবি তাঁহার

'রসুল বিজয়ে' হজরত মোহাম্মদের জীবনে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে মুসলমানের মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কম নহেন বরং বেশী। সুতরাং এমন অলৌকিক জীবনকাহিনী পাঠ করিয়া যেন লোক মুগ্ধ হয় এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে; ···কাব্য-খানির পশ্চাতে ধর্মপ্রচারমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।[৪৫]

শাহ্ মুহম্মদ সগীর সম্পর্কে আলোচনারও পথিকৃৎ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৭ই ভাদ্র (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে তিনি 'শাহ্ মোহাম্মদ সগীর' প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বহু বৎসর পরে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তিনি সগীর ও ইউসুফ জোলেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিষয়টি নিয়ে 'মনীষা-মঞ্জুষা' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে 'শাহ্ মুহম্মদ সগীর' নামে পূর্বাপেক্ষা পুনর্লিখিত একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রবন্ধে সগীর এবং 'য়ুসুফ জোলেখা' সংক্রান্ত বিষয়ে, বিশেষ করে কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে, পক্ষান্তরে 'মনীষা-মঞ্জুষার' প্রবন্ধের মধ্যে আনুপূর্বিক কাব্য-কাহিনী ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত প্রবন্ধে ডক্টর হক বলেছেন: "অপিচ 'য়ুসুফ জোলেখা'র ভাষা অনেক বিষয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' ও 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র ভাষার মধ্যবর্তী হারানো সূত্রকে ধরাইয়া দেয়"।[৪৬] এ কাব্যের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত আলোচনা করে লেখক সগীরকে জয়নুদ্দীন ও মালাধর বসুর পূর্বসুরি বলে দাবি করেন।

ডক্টর হকের প্রবন্ধাবলী বিষয় ও স্বভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী। তবে সমাজ, সংস্কৃতি ও সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। এ সব প্রবন্ধ তাঁর পাণ্ডিত্য ও মতামতের বাহন। তবে সে মতামত অবশ্যই তথ্যনির্ভর। সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, শাহ্ মোহাম্মদ সগীর, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি, শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়' ইত্যাদি প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দিক নির্দেশকারী রচনা। অন্যদিকে বুলবুল (ফাল্গুণ ১৩৪৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন সমস্যা,' (মোহাম্মদীতে বৈশাখ ১৩৫৩) প্রকাশিত ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান, বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকায় (শরৎ ১৩৭৭) প্রকাশিত 'বাংলা নববর্ষ' ইত্যাদি প্রবন্ধ বাঙালি মুসলিম জীবনে প্রেরণা ও সমাধানের বাণী বাহক।

ইদানীং ডক্টর হকের প্রবন্ধমালার সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা রচনাবলী থেকে সংগ্রহ করে, সেগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে 'মনীষা-মঞ্জুষা' নামে প্রকাশ করা হচ্ছে। এ নামে তিন খণ্ডে যথাক্রমে সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতি-বিষয়ক বাছাই-করা প্রবন্ধ সংকলনের, গৃহীত প্রকল্পের, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ-সংগ্রহ তাঁর রচনাবলীর সামান্য অংশ মাত্র। তবে লেখকের মন ও মনীষার পরিচয় হিসেবে তিন শ্রেণীর রচনা বা ভাবনার দিকদর্শনের কাজ করবে এই সংকলনত্রয়।

'মনীষা মঞ্জুষা' প্রথম খণ্ড (১৯৭৫), ডক্টর হকের বেশির ভাগ পূর্ব প্রকাশিত এবং কয়েকটি পূর্বে-অমুদ্রিত প্রবন্ধের সংকলন। কালের দিক থেকে বলতে গেলে, ১৯৩৬ থেকে ১৯৭৫, এ-প্রায় চল্লিশ বছরের পরিসীমায় প্রবন্ধগুলোর লেখন ও লালন ঘটেছে। বিষয়বস্তু অনুসারে এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১॥ প্রাচীন ও মধ্যযুগ-বিষয়ক

প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিগ্‌দর্শন [?]
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, (ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০, ঢা. বি.)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, [আদি ও মধ্যযুগ] (মাহে নও, চৈত্র ১৩৬৩)
শাহ্ মুহম্মদ সগীর, (ঐ, আষাঢ় ১৩৫১)
(দ্র. এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ ব. সা. প. প. ১৩৪৩)
নবাবী আমলের জনৈক মুসলিম কবি, [?]
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মুসলিম মহিলা কবি, বা. এ. প. ১৯৫৭
নতুন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা, মোহাম্মদী, আষাঢ় ১৩৪৯

২ ॥ **আধুনিক যুগ-বিষয়ক**

আধুনিক যুগের দিগ্‌দর্শন; রাবীন্দ্রিক যুগের দিগ্‌দর্শন; যুদ্ধোত্তর যুগের দিগ্‌দর্শন: সামাজিক পটভূমিকায় প্রাক্-বঙ্কিম বাংলাসাহিত্য; নজরুল কাব্যে তারুণ্য; নজরুলের কবি প্রতিভা; ফজলুল হক সেলবর্ষী; নবনূর (মাহে নও, চৈত্র ১৩৬৪), নবীন প্রতিভার রূপ (নবীন সেন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১৯৪৬)।

৩ ॥ **লোকসাহিত্য-বিষয়ক**

বাউল গান পরিচিতির মূলসূত্র (মোয়াজ্জিন, শ্রাবণ ১৩৪৩); সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লীসংস্কৃতির উৎস নিরূপণ; লোক-সাহিত্য (বরিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের লোকসাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ ১৯৫৭)।

ডক্টর হক বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসরচনায় তাঁর শক্তি নিয়োজিত করেন নি কিন্তু ইতিহাসের যে আংশিক কাজ করেছেন, যে উপকরণ আবিষ্কার করেছেন, সমালোচনা-সূত্রে যে পথ-নির্দেশ করেছেন তা খুবই কল্যাণপ্রদ হয়েছে। এ যাবৎকালে রচিত ইতিহাস সম্পর্কে ডক্টর হক মন্তব্য করেছেন:

> এখনকার ইতিহাসগুলো যতই সমালোচনামূলক হোক না কেন এগুলো একদিকে যেমন অতীতের প্রতি আধুনিক মনের প্রক্ষেপ, অন্যদিকে তেমন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের আলোচনা বর্জিত একতরফা রচনা। এ ইতিহাসের পূর্ণ সার্থকতা নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য—হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সম্মিলিত বাঙ্গালীর সাহিত্য। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠে এ ধারণা পোষণ করার উপায় নেই।[৪৭]

তাঁর মতে আমাদের সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসে যুগ-ভাগ বা কাল নির্ণয় অতীব ত্রুটিপূর্ণ। একমাত্র দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ছাড়া অন্য কোন রচনায় 'চিৎ-প্রকর্ষসূচক' যুগ-বিভাগ নেই। 'এ-সাহিত্যের যুগ-নির্ণয় সমস্যাটাই এর পঠন ও পাঠন ব্যাপারে একটা জটিল সমস্যা'। 'আমরা কাল নির্ণয়ে যত শক্তি ক্ষয় করেছি, যত পাণ্ডিত্য দেখিয়েছি কাব্য পাঠে তত মনীষা দেখাতে পারিনি।'[৪৮] আমাদের ঐতিহাসিক-গণ এ-সাহিত্যের মধ্যযুগ যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তা ডক্টর হক অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন, ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ৬০০ বছরের সাহিত্যকে যাঁরা মধ্যযুগের সাহিত্য নামে অভিহিত করেন ইয়োরোপীয় ইতিহাসের 'মিডাইভ্যাল এজ'-এর কালগত ধারণা ছিল তাঁদের মাথায়। তাঁদের ইতিহাসের একালের স্থিতি হলো ১০০০ থেকে ১৪০০ খ্রীস্টাব্দ। অতঃপর ইয়োরোপে চিৎপ্রকর্ষ বা 'রেনেসাঁ' আরম্ভ হয়েছে। সে দেশে রেনেসাঁ শুরু হয়েছে তুর্কিদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর অথচ বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের পর আরম্ভ হয়েছে মধ্যযুগ। ডক্টর হকের জিজ্ঞাসা: "আমরা

কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যযুগে বর্বরতার যুগেই বাস করছিলাম?''[৪৯] এ-এক ভুল ধারণা কারণ তুর্কি বিজয়ের পর 'দেশে চিন্তার বিপ্লব ঘটেছে'—'রেনেসাঁ এসেছে'—'চিৎপ্রকর্ষ সাধিত হয়েছে'। এ যুগকে ইয়োরোপের 'মিড্‌ল্ এজ'-এর মত করে মধ্য যুগ বলায় তাই আপত্তি থাকতে হবে।

বাংলা সাহিত্যের এ-ছ'শ বছর একটানা মধ্যযুগীয় বিশেষত্ব চিহ্নিত করাও গোঁজা-মিলের কাজ। 'সাহিত্যের ইতিহাস চিৎপ্রকর্ষের বিচিত্র কাহিনী'—'চিৎপ্রকর্ষের অভিব্যক্তি এক নয়, বহু'। চিৎপ্রকর্ষের অভিব্যক্তিকে উপলক্ষ ধরেই এ-বিরাট কালসীমাকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তাই ডক্টর হক এ-ছ'শ বছরকে ১. তুর্কী-যুগ ১২০০-১৩৫০, ২. সুলতানী-যুগ ১৩৫১-১৫৭৫ এবং ৩. মোগলাই-যুগ ১৫৭৬-১৭৫৭—-এভাবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

'প্রাচীন ও মধ্যযুগের দিগ্‌দর্শন' প্রবন্ধটিতে নতুন আলোর প্রক্ষেপ নেই। তবে প্রচলিত ধারণাকে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় করে তোলার পক্ষে এ-রূপরেখাধর্মী নিবন্ধটি মূল্যবান। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' প্রবন্ধটিতে তুর্কি বিজয় থেকে পলাশীর পতন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম শাসন (১২০১-১৭৫৭) কালের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাবের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস আছে।

আলোচ্য পর্যায়ের দিগ্‌দর্শন-মূলক তিনটি প্রবন্ধই রূপরেখা-ধর্মী। প্রত্যেকটি যুগের সাহিত্যের মূল ধারার পরিচয়কে লেখক এখানে পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। লেখক ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যকে সুস্পষ্ট তিনটি মূল পর্যায়ে দেখেছেন। বিবর্তনের ধারায় এ স্তর তিনটিতে তিনি অনেকগুলো চিৎপ্রকর্ষিক উপধারা লক্ষ্য করেছেন। যেমন 'আধুনিক যুগের দিগ্‌দর্শন' (১৮১২-১৯৫১) পর্যায়ে যুগসন্ধি পাশ্চাত্য প্রভাবিত মহাকাব্য, গীতিকাব্য, স্বাজাত্যবোধ উদ্রেককারী কাব্য, অনুবাদ কাব্য, ব্যঙ্গ কাব্য, মুসলিম কাব্য সাধনা ইত্যাদি ধারা মৌলিক চেতনাসমৃদ্ধ। রাবীন্দ্রিক যুগের (১৮৮০-১৯২৩) দিগ্‌দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ ও তৎপ্রভাবিত কাব্যধারা ম্রিয়মাণ মহাকাব্য ধারা এবং কাব্য-সাধনার স্বাধীন প্রচেষ্টা এ-তিনটি বিশিষ্ট চেতনার অভিব্যক্তি এবং রূপ ও রসের পরি-চায়ক। যুদ্ধোত্তর যুগের দিগ্‌দর্শন (১৯১৮-১৯৭০) পর্যায়ে লেখক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ এবং পাকিস্তান আমলের সমাপ্তি কালকে বুঝিয়েছেন। একালের সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান-প্রধান ধারাকে তিনি রেখাঙ্কিত করেছেন। তাঁর মতে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্রোহী চেতনা, অনুসরণ ও অনুকরণ প্রবণতা, পাশ্চাত্য বৈদগ্ধ্য প্রবণতা, গ্রাম-বাংলার রূপায়ণ, সমাজ-সচেতনতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কাব্যে গদ্যময়তা। মতামত ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে তবে কাল ও সাহিত্য ধারা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল তাৎপর্যপূর্ণ।

এই দিগ্‌দর্শনগুলো এক সময় প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত হয়েছিল। সাহিত্যের গতিধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রবন্ধত্রয়ের মূল লক্ষ্য। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ সমকালীন সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী—তিনি সংস্কারমুক্ত মনে ধর্ম বর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে থেকে সর্বকালের সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন আলোচনায় তিনি বলেছেন :

> আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যের এই বাণী রুশীয় আদর্শ অনুকরণের ফল বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে ইসলামের 'ভ্রাতৃত্বে'-র কোন প্রভাব নাই—এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। আজকাল যেন আমাদের কবিরা বলিতে চাহেন, মানুষ সকল ভয়, সকল সংস্কার, সকল মিথ্যা ও সকল দৌর্বল্যের হাত হইতে মুক্ত হউক।[৫০]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল সকল সমালোচক ও গবেষকের নিকট আকর স্বরূপ। ডক্টর হক নজরুল সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মধ্যে নজরুলের কাব্যে তারুণ্য, নজরুলের কবি প্রতিভা এবং ইসলামী আদর্শের ব্যাখ্যাতা নজরুল ইসলাম[৫১] প্রধান। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি একটিও প্রবন্ধ লিখেন নি। রবীন্দ্র-যুগের দিগ্‌দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে ক'টি মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-ই তাঁর উল্লেখযোগ্য লিখিত মন্তব্য।

ক. বাংলা কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাঁহার সহিত তাঁহার অনুকারীদের কোন তুলনা হয় না। ইহার এক মাত্র কারণ তাঁহার সংস্কার মুক্তি ও চিন্তার বিস্তৃতি। (পৃ. ৩১)

খ. তাঁহার কাব্যে উপনিষদ হইতে তসব্বুফ পর্যন্ত প্রাচ্য সাধনার এবং মুনি ঋষি হইতে বাউল ফকির পর্যন্ত প্রাচ্য মর্মবাদী সাধকদের চিন্তাধারার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে। (পৃ. ৩১)

এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব ও পরিধি সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং রবীন্দ্র কাব্যের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ফুটে উঠে। ফজলুল হক সেলবর্ষীর মত ভাগ্যহত কবি সম্পর্কে লেখার লোক বেশি নেই। ডক্টর হক এই উৎসর্গীত প্রাণ দেশপ্রেমিক, সমাজকর্মী ও সাংবাদিক সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে মহৎ কাজ করেছেন। তিনি কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন: 'দেশ কখনো তাঁহার এই ত্যাগের মর্যাদা দান করে নাই'। মন্তব্যটি হৃদয়গ্রাহী এবং আমাদের অকৃতজ্ঞ স্বভাবের প্রতি আঘাত। 'নজরুলের কবি প্রতিভা' শীর্ষক কথিকার শেষাংশে তিনি বলেছেন:

> আমি মনে করি, নজরুল ইসলাম বাংলার একজন যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়ে শুধু নতুন যুগের সম্ভাবনা নিয়ে এলেন এমন নয়, 'রবীন্দ্রযুগের' মধ্যেই 'নজরুল-যুগের' প্রতিষ্ঠা করলেন। দিন যতই বেড়ে চললো, ততই রবীন্দ্রযুগের সঙ্কোচন ও নজরুল যুগের সম্প্রসারণ শুরু হলো। কার্যত দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর যুগের প্রভাব বাংলা-সাহিত্য থেকে একরূপ বিদায় নিয়েছে; আর তার সাথে বেড়ে চলেছে কবি নজরুলের প্রভাব। (পৃ. ২০৫)

লেখকের এ-মত এক বাক্যে মেনে নেওয়া সচেতন পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর যুগের প্রভাব বাংলা সাহিত্য থেকে বিদায় নিয়েছে এবং নজরুলের প্রভাব বেড়ে চলেছে এ-মত তথ্য-নির্ভর নয়। 'শেষের কবিতা'-উত্তর রবীন্দ্রনাথ এবং 'শ্যামলী'-'পত্রপুট'-'আকাশ প্রদীপ'-এর রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে জীবনচেতনা এবং শিল্প সাধনায় যে অভিনবত্ব দান করেছেন তা আধুনিক ছোটগল্প, উপন্যাস ও আধু-নিক কবিতার সচেতন পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অন্তঃসলিলা প্রবাহের মত। রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনধর্মী, নজরুল বিনিঃশেষধর্মী। কাব্যের ক্ষেত্রে 'অগ্নিবীণা' থেকে 'নতুন চাঁদ' পর্যন্ত এলে নজরুলকে নিঃশেষিত দেখা যায়, অথচ রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের নবনব পরীক্ষায় রূপান্তর ও বিবর্তনের ধারায় অসাধারণ সমুন্নতির পরাকাষ্ঠা স্থাপন করেছেন।

'নজরুলের কবি প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'আমার মাথা নত করে দাও হে/তোমার চরণ ধুলার তলে' কবিতার ব্যাখ্যায়ও তিনি বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ আলো-

চনায় খানিক অবমূল্যায়ন হয়তো তাঁর অজান্তেই এসব ক্ষেত্রে ঘটে গেছে। এটা হবার কারণ নজরুলের প্রতি তাঁর মাত্রাধিক দুর্বলতা।

'বাউল গানের মূলসূত্র' প্রবন্ধটি মোয়াজ্জিন পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিক্ষিপ্ত এবং সাধারণ আলোচনা যাই হোক, তখনো উপেন ভট্টাচার্য বা শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয়নি। সুফিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর হকই ১৯৩৪-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বর্তমান নিবন্ধের পাদটীকায় বলেছেন যে "বাঙ্গালার বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে—বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে মৎপ্রণীত 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।" বাউল গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেকটা, আবেগ-আপ্লুতভাবে বলেছেন : বাংলার "বাউলগানে এই দেশের ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসে ... এ যেন নৈদাঘ-মধ্যাহ্নে বাংলার উদাস-করা ঘুঘুর সঙ্গীত, বেতস-লতার অন্তবর্তী দোয়েলের শিস। এ সঙ্গীতের তালে প্রাণের সুপ্ত বাসনা জাগরিত হয় না, লুপ্ত কামনা মাতিয়া উঠে না; ইহা ক্ষুধিত আত্মাকে অনির্দেশের সন্ধানে, অজানার লক্ষ্যে টানিয়া লইয়া যায়।" (পৃ. ২০৭-০৮)

'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধটি ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বরিশাল সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে লোক-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ। বাংলার লোকসাহিত্যের বিচিত্র শ্রেণী, সাহিত্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর হকের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশে-ষজ্ঞের দাবিদারের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। এর তত্ত্বগত ব্যাখ্যা বা মটিফ বিশ্লেষণ না করে তিনি বাংলা সাহিত্যের গৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, "বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক, এমন কি ঐতিহাসিক উপাদানও এই লোকসাহিত্যের মধ্যে নিহিত আছে।" (পৃ. ৮৩)। শিষ্ট সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন : "শিষ্ট সাহিত্যের জন্ম বুদ্ধিজীবী ভদ্র সমাজের মস্তিষ্কে, রূপায়ণ কলে-তৈয়ারী কাগজের পৃষ্ঠায়, লালন-পালন মুদ্রাযন্ত্রের নোংরা প্রকোষ্ঠে, আর লোকসাহিত্যের জন্ম জন সমাজের হৃদয়ে, রূপায়ণ লোকের মুখে মুখে, লালন পালন দেশের মানুষের পবিত্র স্মৃতির পরতে-পরতে। তাই লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র দেশজোড়া, শিষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।" (পৃ. ৫৭)

'সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী-সংস্কৃতির উৎস নিরূপণ'-শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক পল্লী-বচন পল্লী-সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত এবং পল্লী-গাথার পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন। সাহিত্যের এ-সব উপাদানের মধ্যে পল্লী-সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত রয়েছে। ডক্টর হক মনে করেন আমাদের পল্লী সংস্কৃতির এ-সব উপাদান অনার্য, আর্য এবং মুসলিম সংস্কৃতির সৃষ্টি। এর কোথাও এ তিন সংস্কৃতি মিলে একাকার হয়ে গেছে, আবার কোথাও বা মেশেনি, কোথাও বা পাশাপাশি বসে দর্শকের মনে অপরিসীম কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। (পৃ. ১০৮)

'নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা' প্রবন্ধটিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানাস্তরে মুসলিম প্রভাবের ঐতিহাসিক সমীক্ষা রয়েছে। তিনি বলেছেন : "বাংলা ভাষার জন্ম হইতেই এ দেশের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, এ দেশের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস ও ভাষার ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে মুসলমানদের সাধনাও জড়াইয়া রহিয়াছে।" (পৃ. ২৪৩)

এ প্রবন্ধে ডক্টর হকের একটি মূল্যবান পরীক্ষা এই যে পশ্চিম বাংলায় মুঘল আমলে বটতলার স্টাইল বা হিন্দুস্থানী বাংলার উদ্ভব হয়েছিল, (যাকে মুসলমানী বাংলাও বলা

হয়) "পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা তখন, কি এখন, কোন সময়েই ঘরে কি বাহিরে এমন বাংলা ভাষার[৫২] ব্যবহার করিতেন বা করেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।" (পৃ. ২৭৭)। প্রকৃত সত্য এই যে 'হিন্দুস্থানী-বাংলা' তখনও যেমন অচল ছিল, আজও তেমনি অচল। ইহার উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের সহিত বাংলা ভাষায় ব্রজবুলির উৎপত্তি ও সাহিত্যিক প্রয়োগের তুলনা করা চলে। যাঁরা মনে করেন পলাশীর বিপর্যয় না ঘটলে বটতলা স্টাইল বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত স্টাইল হতো,—ফোর্ট উইলিয়ম পরবর্তী 'বাংলা' সাহিত্যে স্থান পেতো না, সৈয়দ হামজা-গরীবুল্লাহ্ শৈলী উত্তরকালের সাহিত্যের ভাষা হতো এ ধারণা, ডক্টর হকের মতে 'ব্যর্থ মানসিকতার' পরিচয়। সে সাহিত্যের লেখক ও পাঠক সংখ্যা প্রচুর ছিল কিন্তু 'তাহা দিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করিতে যাওয়া মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়।' ডক্টর হক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন: "যাঁহারা বটতলার সাহিত্যের নামে উৎসাহে মাতিয়া উঠেন এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাত্রাহীনতার পরিচয় দেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া মনে রাখেন যে, বটতলার সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শবদেহ মাত্র। ইহার স্রষ্টারা এই শবদেহ জোগাইয়াছেন বাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অনুন্নতমনা পাঠক-শকুনির উদরপূর্তির জন্য। রুচির কথা, রসের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শকুনি জাতীয় জীবকে বাঁচাইবার জন্য শবদেহের আবশ্যকতা আছে বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, তবে অবনত মস্তকে স্বীকার করিব, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বটতলার সাহিত্যেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে, শবদেহের একটা সুব্যবস্থা করিবার জন্যই বিশ্বস্রষ্টা শকুনি সৃষ্টি করিয়াছেন, শকুনির জন্য শবদেহ সৃষ্টি করেন নাই।" (পৃ. ২৮৩)। তাঁর পর্যালোচনা সরস ও যুক্তিবাদী।

তথ্যনির্দেশ

১ মাহবুব-উল আলম : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (প্রবন্ধ) : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৩৫-৩৬

২ Acc. No. A43931 B 891.4409 ENA বাংলা একাডেমীতে একটি মুদ্রিত কপি (সংখ্যা ১৬৭৫৩) আছে কিন্তু সামনের ২২ পৃষ্ঠা ছিন্ন।

৩ পুরানো বানান শুদ্ধ করে নতুন বানানে রূপান্তরিত করে দেওয়া হলো।—লেখক।

৪ হক, ডমুএ ও করিম : আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, কলকাতা, মার্চ ১৯৩৫, পৃ. ৬৬

৫ তদেব, পৃ. ২৮

৬ তদেব, পৃ. ৪৩

৭ সেন, দীনেশচন্দ্র : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, কলকাতা ১৯২৭, পৃ. ৪৭৮-৮৬

৮ হক, ডমুএ : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বি-সং ঢাকা ১৯৬৫, পৃ. ২৪১

৯ হক ও করিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১০ তদেব, পৃ. ৬৫

১১ তদেব, পৃ. ১০০

১২ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃ-খ, প্র-স, কলিকাতা ১৯৬৬, পৃ. ৬৮২

১৩ Huq, Dr. Md. Enamul : A History of Sufi-ism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1975 P. Preface V.

১৪ তদেব, পৃ. ৫২

১৫ তদেব, পৃ. ১৩৮

১৬ তদেব, পৃ. ২৬০

১৭ তদেব, পৃ. ২৭৬

১৮ Sen, Dinesh Chandra : Chaitanya and His Companions, Calcutta University, P. 177

১৯ হক, ডমুএ : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বি-স ১৯৬৫, পৃ. ৫১

২০ পূর্বোক্ত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৬৮৩

২১ চ্যাটার্জি, সুনীতিকুমার : বই, (ঢাকা) একাদশ বর্ষ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৭৭-৭৮

২২ পূর্বোক্ত, A History of Sufi-ism in Bengal, P. 302

২৩ তদেব, পৃ. ৩০৯

২৪ তদেব, পৃ. ৩৬৭

২৫ পূর্বোক্ত, বই, পৃ. ৭৭

২৬ হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব, মোহসীন এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ১১

২৭ তদেব, পৃ. ৩

২৮ তদেব পৃ. ৮

২৯ হক, ডমুএ : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা ১৯৪৮, পৃ. ১২

৩০ পূর্বোক্ত, বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃ. ১৬

৩১ হক, ডমুএ : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পু. মু. ১৯৪৮, পৃ. ভূমিকা ক

৩২ মঈনুদ্দীন, মুজাহিদ, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (সমালোচনা) আজাদ, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

৩৩ হক, ডমুএ : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, দ্বি-মু. ১৯৬৫, পৃ. ১-২

৩৪ পূর্বোক্ত, আজাদ, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

৩৫ গোলাম মোস্তফা : "মুসলিম বাঙ্গলা-সাহিত্য", আজাদ, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

৩৬ সৈয়দ আবদুল মান্নান : 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে' চলতি ভাষার পুথি, ১৩ অক্টোবর, ১৯৫৭

৩৭ মঈনুদ্দীন মুজাহিদ : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

৩৮ মোহাম্মদ আকরম খাঁ : অবদান, না, অপদান ? ২৪ নভেম্বর ১৯৫৭

৩৯ তদেব, আজাদ ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৪০ আজাদ ৫ই আশ্বিন ১৩১৪, পৃ. ৬

৪১ Huq, Dr. Md. Enamul : Muslim Bengali Literature, Pakistan Publication, Karachi ; Printed at Din Muhammadi Press, Mcleod Road, Karachi, 1957, P. 231

৪২ 'আমার প্রবন্ধের হিসাব আমার কাছে নেই। প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি কলিকাতার তৎকালীন মাসিক পত্রিকায় ; বুলবুল, ছায়াবিথি, মাসিক মোহাম্মদী, মাহেনও, সাধনা প্রভৃতি মুসলিম বাংলার মাসিক পত্রিকায় ও নানা সাময়িকীতে

আমার কত প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে ও হারিয়ে গেছে তার খবর আমি রাখিনি,—রাখ্‌বার আবশ্যকতাও অনুভব করিনি। তবু যদি আন্দাজী সংখ্যা সম্বন্ধে জোর করে, বলব সে-সংখ্যা বিগত ৫০ বছরে অন্যূন ২০০ হবে।' ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ব্যক্তিগতপত্র, ২রা জানুয়ারী, ১৯৮০

৪৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), একচত্বারিংশ ভাগ, কলকাতা ১৩৪১, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৩৮

৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রিচত্বারিংশ ভাগ) ১৩৪৩, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৯৩-১০৯

৪৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১-১০২

৪৬ তদেব, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৩, পৃ. ১৪২

৪৭ মনীষা-মঞ্জুষা (১ম খণ্ড), মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ৩

৪৮ তদেব, পৃ. ২

৪৯ তদেব, পৃ. ২

৫০ তদেব, পৃ. ৩৯

৫১ বরেন্দ্র সাহিত্য পত্রিকা, রাজশাহী ১৩৬৭, পৃ. ১৪৮-৫১

৫২ মর্দমী জাহের যার আছে জাহানেতে।/ তার নাগাত কেচছা আছে কেতাবেতে ।।/ আল্লার মকবুল শাহা গরীবুল্লাহ নাম।/ বালিয়া হাফজপুর যাহার মোকাম ।।/ আছিল রওশন দেল শায়েরী জবান।/ যাহারে মদদ গাজী শাহা বড় খান ।।/ ('আমীর হামজা', সৈয়দ হামজা)।